Srigsri Dinabandhu Bani
Mahatmya
1930

অনুক্রমণিকা।

যাঁহার পুণ্য আবির্ভাবে সমস্ত বিশ্বে ওলট পালট পরিবর্ত্তন ও নব জাগরণের মহাভাব সমুপস্থিত, জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রেরণায় সমস্ত জাতি সমস্ত মানবমণ্ডলী উদ্বুদ্ধ, যাঁহার শ্রীমুখ হইতে সনাতন বৈদান্তিক ধর্ম্মভাব সমূহ অনাবিল প্রস্রবণবৎ প্রবাহিত হইয়া মহামূর্খকে মহাজ্ঞানীর গুরু এবং বিদ্বান মণ্ডলীকে বিস্মিত স্তম্ভিত করিয়াছে; এবং ভক্তজনকে ঐ ভাব প্রবাহে নিমজ্জিত করিয়া আনন্দে পাগল করিয়া তুলিয়াছে,—তাঁহার সেই অমৃতময় [illegible]ল "বেদবাণী" শুনিবার জন্য কাহার প্রাণ না ব্যাকুল হইবে?

যিনি নিজে ঋণী হইয়াও মূর্খকে জ্ঞান, বুভুক্ষুকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র এবং রুগ্নকে ঔষধ দ্বারা স্বহস্তে সেবা করিয়া দরিদ্র [illegible]-নারায়ণ সেবার যে মহান আদর্শবিধি দেখাইয়া গিয়াছেন, বালবৃদ্ধবনিতা এমন কি আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত যাঁহার মহান্ [illegible]বিত্র, অহৈতুকী প্রেম পীযূষ দ্বারা স্নাত, প্লাবিত হইয়াছে; যাঁহার মূল্য জীবনের [illegible] কাল সহস্র সহস্র বৎসরের নির্য্যাতিতা [illegible]শা মাতৃজা[illegible]র জন্য মাতৃভাবে কাটিয়া গিয়াছে,—সেই [illegible]সই মহা প্রেমোজ্জ্বল স্বরূপ, সেই দীন দুঃখীর প্রাণের [illegible]র ঠাকুরের জ্ঞানের কথা, প্রেমের কথা, প্রাণের [illegible]রিতে সকলেই আগ্রহান্বিত উৎকণ্ঠিত জানিয়া তাঁহার [illegible]ণী সমূহের কিয়দংশ সঙ্কলন করিতে এই দীনজনের [illegible]চেষ্টা।

যে [illegible]বের প্রতি হুঙ্কারে মেদিনী কম্পিত হইত, আতঙ্কে [illegible]দস্যু মূর্চ্ছা যাইত, মহাযোদ্ধার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, সেই

মহাবীর্য্য স্বরূপ ওজোস্বরূপ, ক্ষাত্রশক্তি ব্রহ্মতেজঃ স্বরূপ অবতার রুদ্রের মহাবাণী প্রকাশ করিতে তাঁহার লক্ষ লক্ষ ভক্তের অনুরোধে অক্ষম হইলেও তাঁহার অমূল্য ভাবগুলি গ্রন্থিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমাকে বাধ্য করিয়াছে। এই অপূর্ব্বভাবের পাগল মানুষকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কেন্দ্রাবতার ভাবিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান কৃশ্চিয়ান জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বাংলার লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির নিত্য পূজা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার স্থূলভাবে বর্ত্তমানে তাহারা তাঁহার অমিয় প্রাণ ভোলা কথা শুনিয়া মধুর আত্মহারা আনন্দের সঙ্গ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন এইক্ষণে তাঁহার স্থূলভাবে সঙ্গলাভের অভাবে বহু ভক্তই তাঁহার "বাণী ও "লীলা মাহাত্ম্য" গ্রন্থ সঙ্গ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কয়েকজন 'অন্তরঙ্গ ভক্ত সম্মিলিত ভাবে তাঁহার "লীলামাহাত্ম্য" গ্রন্থ লিখিতেছেন। এবং ভক্ত কবিগণ বিরচিত তাঁহার "গীত-মাহাত্ম্য" গ্রন্থ ও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণে তাঁহার লীলার মোটামুটি ভাবে সূচীপত্র হইতেও অতি সংক্ষিপ্তাকারে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় ধীরেন্দ্রনগর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকাশ মহোৎসবে দেশ সেবায় সর্ব্বত্যাগী চির-কৌমারব্রতাবলম্বী মহাপুরুষ নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ঠাকুর শ্রীশ্রীদীনবন্ধু দেব"৹ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করা গেল। এবং প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি শ্রীমূর্ত্তির ফটো সন্নি-বেশিত হইল। ভুল ত্রুটি অনেক রহিয়া গেল। যাঁহার নামে যাঁহার কথায় অবারিত শান্তি বর্ষিত হয়, সেই মানুষের কথার গুণেই তাঁহার ভক্ত সমাজে আশা করি সমস্ত অক্ষমতার ত্রুটি উপেক্ষিত হইবে। অলমিতি বিস্তারেন ওমিতি।

১৩৩৭ জন্মাষ্টমী। সংকলয়িতা।

সূচীপত্র।

বিষয় : পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা

—

ঠাকুর শ্রীশ্রীদীনবন্ধু দেব।

শ্রীশ্রীদীনবন্ধু বাণী মাহাত্ম্য।

অবতার।

অবতারের আবির্ভাব হয় কেন?

> "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

কি আশার বাণী! কি আনন্দের বার্ত্তা!! যখন যখনই ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হ'বে, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হ'বে, তখন তখনই প্রভু আত্ম প্রকাশ ক'রবেন! তিনি সাধুদের ত্রাণের জন্য আর দুষ্টগণের বিনাশের জন্য, যুগে যুগেই এইরূপে জগতে এসে থাকেন। তাঁর আগমনেতে সারা দুনিয়ায় তখন কুরুক্ষেত্র নেবে আসে, মহাবিপ্লব-বন্যায় জগৎ প্লাবিত হ'য়ে যায়; তারপর আবার নূতন জগৎ বের হয়ে আসে। নূতন যুগের শান্ত শ্রী'র ওপর নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান হয়, জগৎ বহু কালের জন্য প্রশান্তি-স্নাত করে।

ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হয় কখন? যখন পারমার্থিক ও সামাজিক অবনতি ঘটে। তখন নীতি ও সম্পদ দুইই নষ্ট হ'য়ে যায়— নীতি নষ্ট হ'লে সম্পদ নষ্ট হয়, আবার সম্পদ নষ্ট হ'লে নীতিও নষ্ট হ'য়ে যায়। দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'লে সমাজনীতি কি ধর্ম্মনীতি কোন নীতিই আর থাকে না। উচ্চ শ্রেণীরা-যারা ধনে জনে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, তারা নিম্ন শ্রেণীদের, যারা দরিদ্র দুর্ব্বল মূর্খ তাদের ওপর এমন ভাবে কর্ত্তৃত্ব হামবড়া ভাব জাহির করে যে তাদের "নাই"র মধ্যে যা আছে তা লুট্‌তে থাকে। কারণ উচ্চশক্তি যখন যে দেশে যেরূপ ব্যবহার কত্তে থাকে, তখন সে দেশের ছোট বড় সর্ব্বপ্রকারের প্রবল শক্তি, দুর্ব্বল শক্তির ওপর সেইরূপ ব্যবহারই ক'রে থাকে। তাই তখন সমাজ থাকে না, সকলেই যার যার সুবিধামত চল্‌তে থাকে, দেশ দশের দিকে আর কেউ ফিরেও চায় না। সমাজ লুপ্ত হ'লে ধর্ম্ম আর দাঁড়াবে কার'পর? তিনিও অন্তর্হিত হন। ধর্ম্ম চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি ও লোপ পেতে বসে। পুত্র পিতার সহিত সম্বন্ধ রাখে না, পিতা পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়। স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ, ভাই ভগ্নী সম্বন্ধ, বন্ধু-বান্ধব গুরু-শিষ্য সকল রকমের সম্বন্ধই নষ্ট হ'য়ে যায়। পরস্পর সম্বন্ধ না থাক্‌লে সৃষ্টি থাকেনা, সৃষ্টি না থাক্‌লে সৃষ্টিধর বিশ্বপিতার ভাঙ্গাগড়া রূপ লীলা রহস্যের রস মাধুর্য্য থাকেনা। তাই তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠেন, এবং কোন এক মানব বা মানবী শরীরে প্রকাশ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হ'য়ে তাঁর

গ্যাগমনে যে বিপ্লব আসে, তা সমস্ত পৃথিবীকে ভেঙ্গে আমূল পরিবর্ত্তন ক'রে, নূতন ক'রে গড়তে থাকে। নূতন রাজার নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠে, নূতন হাওয়া বইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে আবার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়ে উঠে।

এইরূপে বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়াই সুশৃঙ্খলার, অমঙ্গলের মধ্য দিয়াই মঙ্গলের, দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়াই সুদিনের অভ্যুদয় হ'য়ে থাকে। কত বার প্রভু কত ভাবে কত রূপে এই রূপে প্রকাশ হ'লেন। যখন যখনই অসুরগণের অত্যাচারে ধরার মাতৃ-জাতিটা বিধ্বস্ত হতে গিয়েছিল, তখন তখনই সেই অনন্ত মহাশক্তি— অসুর নাশিনী কালীকা রূপে, দুর্গতি হারিণী দুর্গারূপে, চামুণ্ডা রূপে, জগদ্ধাত্রী রূপে জগদ্ধাত্রীর নারী শরীরে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

যখন বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম ভারত হ'তে লুপ্ত হ'তে যাচ্ছিল, ভারতে প্রকৃত ত্যাগী, ভোগী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও প্রেমিকের আসন একেবারে শূন্য হয়ে উঠেছিল, তখন প্রভু বহু রূপ ও আকৃতি নিয়ে প্রকাশ্যশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ রূপে সুপ্রকাশ হ'য়েছিলেন। এই রূপেই তিনি যুগে যুগে অধঃপতিত, ধ্বংসোন্মুখ স্থানে প্রকাশ হ'য়ে থাকেন। দুঃখী তাপী, পাপী, দীন-দরিদ্র, আর্ত্ত আতুর, নিরাশ্রয় নির্য্যাতীত, দুর্ব্বলের জন্যই তিনি এসে থাকেন; ধনী, মানী, অহঙ্কারীর জন্য নহে। সর্ব্ব যুগ হ'তে এবার ধরণীর তমান্ধকার এবং প্রভুর করুণার এবার সমধিক বিকাশ। এবার পাপী তাপী ধনী মানী, মূর্খ আর্ত্ত কেউ বাদ যাবে না, সকলেই

তার অহৈতুকী করুণা পা'বে। এবার যে তাঁর দ্বার অবারিত শাস্ত্রে শুনেছ 'কলি শেষে সত্য যুগ আসবে'! এই-ই সেই সত্য-সাম্য-জাগরণ যুগের আগমন!' অহো কি আনন্দ! সবে আনন্দ কর! আনন্দ কর!!

অবতার শরীরে তিনি বিশেষ ভাবে প্রকাশ থাক্‌লেও সর্ব্বদা সর্ব্বদেহে সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র ওতঃ প্রোত ভাবে নিত্য কাল রয়েছেন। এ স্থূল দেহটা স্থূলদেহী জীবের স্বীয় রূপ প্রত্যক্ষ কর্‌বার যন্ত্র স্বরূপ। এতে সমস্ত শক্তির ঘনীভূত ভাবের বিকাশ; তাই যে একবার দেখবে, পূর্ব্ব স্বভাব স্মরণ হওয়ায় সেই-ই মুগ্ধ হ'য়ে যাবে, চ'লে আসতে চাবে, মিশতে চাবে। যে কোন শক্তি এর নিকট আস্‌বে— টেনে নেবে, তাকে স্বরূপ চিনিয়ে দেবে। এ যে জীবন্ত চুম্বক এর এম্‌নি প্রভাব।

উহার স্বরূপ।

যে—“আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন,
আপনে আপনা চাহে কর্ত্তে আলিঙ্গন।”

এ নিজেকে নিজে আলিঙ্গন কর্ত্তে চায়! নিজের মধ্যে আবার মিশে যেতে চায়! এ এমনই পরশমণি যে, শুধু লোহাকে সোণা বনায় না, যা যা নিকটে পাবে, তাকেই নিজের স্বরূপ পরশ ক'রে ছাড়বে। যাকে ছোঁবে, যে ছোঁবে সেই-ই ধন্য হ'য়ে যাবে। তার হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হ'য়ে যাবে, সে সমাধিঘরে গিয়ে স্ব-ভাবময় হ'য়ে যাবে।

আর দেখ্‌বে—জগতের সমস্ত শক্তিই তাঁর নিকট অবনত

মস্তক। ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎব্যোম্‌ তাঁর মুঠোর মধ্যে, যেন খেলার সামগ্রী। কি জনশক্তি, কি রাজশক্তি, কি পশুশক্তি, দৈবাসুরশক্তি, সর্ব্বশক্তিই তাঁর পদানত। দেশ কাল পাত্র ও পৃথিবীর অভাবানুযায়ী জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মশক্তি নিয়েই প্রকাশ হ'য়ে থাকেন। লোকগুরু শঙ্করাচার্য্য জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন, তখন জ্ঞানের যত অভাব ছিল তত আর কিছুরই ছিল না। যখন শুষ্কমতামতে সংকীর্ণতায় ধরণী মরুভূমির মতন হ'তে যাচ্ছিল তখন শ্রীভগবান্‌ বুদ্ধদেব রূপে এসে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভাব দিয়ে প্রেমবন্যায় আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সারা জগৎ প্লাবিত ক'রে দিয়েছিলেন। আর যখন সর্ব্বটারই অভাব হয় তখন তিনি সর্ব্বশক্তি নিয়েই এসে থাকেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাই পূর্ণ প্রকাশ অবতার।

অবতারগণের শরীরে শক্তি অনুযায়ী কতকগুলি অভিনব চিহ্ন থাকে। শরীরের গঠন মানুষের মতন দেখালেও চোক, কান, নাক, মুখ, হস্তপদাদি একটু আলাহিদা রকমের, দেব ভাবের, ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ প্রভৃতি বহু প্রকারের সাময়িক নূতন চিহ্ন প্রকাশ পেয়ে থাকে। চেনা লোকেই সহজে চিনে ফেলে।

অবতার শক্তি কোটি কোটি জীবকে দর্শনে স্পর্শনে মুক্ত ক'রে থাকেন। এবং লক্ষ্যে অলক্ষ্যে সমস্ত পৃথিবীতে যে নব ভাব ধারা প্রেরণ করিয়া থাকেন, তার স্থায়িত্ব বহু শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত। অবতার পুরুষ একদেহে বা একাকী প্রকাশ হন না। তিনি স্বাঙ্গো-

অবতার, অবতার—পার্ষদ, ভক্ত, সিদ্ধ—পুরুষ, ও সাধক সম্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন ভাব।

পাঙ্গ-ভক্ত-সিদ্ধপুরুষ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই অবতার ব্যূহের মধ্যে যাহারা যে ভাবে এসে প'ড়বে তাহারাই চৈতন্য হ'য়ে যাবে।

নিজের অভাব থাকিলে অন্যের অভাব দূর করা যায়না। অবতার পুরুষদের ত অভাবই নাই; তাদের ভক্ত পরিষদের ও কোন অভাব থাকে না, তারা শুদ্ধ-স্বচ্ছ-নিষ্কাম-নির্ম্মলাত্মা-নিত্যমুক্ত। তাই জীবের কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম্ম ক'রে বেড়াতে পারে। এরা যে তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি। এ বিশ্বের সর্ব্ব রূপই যে তাঁর। কিন্তু তফাৎ এই—ঘণীভূত ঐ প্রকাশ লীলার সহায় স্বরূপ প্রতিমুর্ত্তি এরা। এদের সংসর্গে ও সদ্য মুক্তি।

ভক্তেরা তাঁকে সমস্ত সমর্পণ ক'রে তাঁর হাতের যন্ত্রবৎ চালিত হয়। তাদের ভাব—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, যেমন বাজাও তেমনি বাজি, যেমন নাচাও তেমনি নাচি। এরা জীবন্মুক্তাবস্থায় বিহার করে। তাঁরই কার্য্য স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত ক'রে জীবকে শিক্ষা দিয়ে যায়। এদের নিয়েই তাঁর বিশেষ প্রেমের খেলা। ভাঙ্গাগড়াই তাঁর লীলা, তাই এ লীলা রহস্যের মধ্যে এরাই সম্যক কার্য্যকরী, তাঁর খেলুড়ে।

যারা সিদ্ধ পুরুষ, সাধনা দ্বারা সিদ্ধ, তারা তাঁর সম্যক প্রকাশের সময় ও এসে থাকে, আবার অন্য সময় ও এসে থাকে। অবতার শক্তির কভু নিকটে কভুবা দূরে থেকে, তাঁরই প্রবর্ত্তিত পথে কঠোর জীবন যাপন ক'রে—সাধনা ক'রে সেই ধর্ম্মকেই সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করে। এরা ও লোক কল্যাণের

নিমিত্ত সমস্ত শক্তি ব্যয় ক'রে পরিশেষে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়।"

আর এক শ্রেণীর সঙ্গী আসে, তারা সাধক। তারাও তাঁর প্রকাশ বা অপ্রকাশ সময় নিকটে বা দূরে থেকে তাঁরই প্রবর্ত্তিত পথে সদগুরুর উপদেশ নিয়ে তাঁরই আরাধনা করে। গুরুতে তাঁরই বিশ্বাস রেখে—গুরুতে ভগবানে অভেদ জেনে গুরুর সহিত একত্ব হ'য়ে তাঁতেই লীন হ'য়ে যায়। জগতের সকলকেই এইরূপে এই প্রক্রিয়ায় নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ কর্ত্তে হবে।

এরা তাঁর কার্য্যের সহায়ক হ'য়েই আসে, আর অল্প বিস্তর রূপে তাঁর কার্য্যই ক'রে চ'লে যায়। কিন্তু সে ভিন্ন কেউ সেই নিষ্কাম অহৈতুকী প্রেমভাব-ব্রজরস দিতে পারে না।

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে,
কিন্তু, আমা ভিন্ন অন্যে নারে ব্রজরস দিতে।"

অবতার সঙ্গীরা সমস্তই পারে, কিন্তু পারে না কেবল ব্রজরস দিতে, সেই নির্ম্মল অহৈতুকী মহাভাব দিতে; কারণ এ সব যে তারা তাঁর নিকট হ'তেই পেয়ে থাকে, এ যে রাধারাণীর খাস ভাণ্ডারের ধন, পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন যে এ ভাণ্ডারের আর অন্য মালিক নাই। তার এক এক কণা পেয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বিভোলা হ'য়ে যান; অন্য পরে কি কথা।

যখন পৃথিবীতে অবতারের আবির্ভাব হয়, তখন রাজা, প্রজা, ধনী-দারিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সব একাকার হ'য়ে যায়। তাঁর মহাভাব তরঙ্গে খাল, নালা, ডোবা, নদ, নদী সব পূর্ণ হ'য়ে যায়;

কূল ছাপিয়ে ঢেউ উঠে সব চর, চাচড়, ওচখোচ ভেঙ্গে চুরে সমান ক'রে দেয়। দ্বাপরে এইরূপ একবার মহাপরিবর্ত্তন হয়ে গিছলো, এবার আবার সেইরূপ ওলট্‌পালট্ মহাপরিবর্ত্তনের যুগ আরম্ভ হ'য়েছে।

অবতারেই অবতারের সম্যক প্রচার ক'রে থাকেন। যার যে ভাব তা সেই-ই সম্যক প্রকাশ কর্ত্তে পারে। ও গো, বিশ্বাস করো। প্রতি অবতারেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের ভাব, ভক্ত ভাবে সময়োপযোগী ক'রে প্রচার ক'রে তা সুপ্রতিষ্ঠিত ও মহিমান্বিত করেন। এক এক অবতারের অন্তর্ধানের পর পুনঃ অবতারে তাঁর কার্য্যের সমর্থনেই উহার পূর্ণ বিকাশ হ'য়ে যায়। তোমরা কে কি কর্ত্তে পারো? কি করো? যাঁর— তিনিই করেন!

আর কি? এই ত দেখ্‌লে, শুনলে, প্রেমের খেলা খেল্‌লে, এখন কাজে লেগে যাও। দীন-দরিদ্র; এরাই তোমাদের বন্ধু মূর্খার্ত্ত-নির্য্যাতীতেরাই তোমাদের বন্ধু, যাঁরা সহায়-সম্বলহীন তাদের জন্যই ত তোমরা এসেছ! তাদের কাজেই লেগে যাও। জীবে প্রেম কর। জেনো প্রেম-প্রেমই সবওর।

ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে।

ভগবানের নিকট পৌঁছাবার পথই ধর্ম্ম। যে সকল উপায়, ভাব অবলম্বন ক'রে জীব পুনঃ স্ব-ভাবে সেই ব্রহ্মভাবে লীন হ'য়ে যায়,—তার নামই ধর্ম্ম!

ধর্ম্ম এক না বহু।

ধর্ম্ম এক, আবার বহুপ্রকারের। যেমন একই জলরাশি সম্পন্ন পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি নদী বিভিন্ন রংয়ে বিভিন্ন দিক্ হ'তে ভিন্ন ভিন্ন আকারে একই সাগরের দিকে ছুটে চ'লছে, ভিন্ন ভিন্ন ব'লে দেখাচ্ছে, কিন্তু ছুটে ছুটে এসে শেষে সীমায় যেখানে সাগর সঙ্গমে মিলেছে, সেখানে আর তখন কোন বিভিন্নতা নাই, সব এক। তদ্রূপ তোমাদের সকলেরও উদ্দেশ্য যখন ঐ একই সাগরে যাওয়া, তখন সকলে এক রূপে একই পথে না গেলেই বা লোকসান কি? আর যাবেই বা কেমন ক'রে? সকলেই ত আর একরূপ, একই স্থানে নও। তাই যার যে নদী নিকটে, যার যে পথ জানা এবং সুলভ, সে সেই পথেই যাত্রা সুরু করুক। চল্‌তে চল্‌তে সেই অনন্ত ভাব সমুদ্রের মুখে যখন এসে প'ড়্‌বে তখন দেখ্‌বে সকলেই একই ভাবে একই স্থানে এসে মিলছে, সকলেই শেষে গন্তব্য স্থান—ঐ একই মহাসাগরে এসে পড়ছে। তখন ভাব সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তালে তালে চল্‌তে ভারী আরাম। তাই যার যার মনমত পথে সাধনা ক'রে যাও, একদিন সেই ভগবান রূপ মহাসাগরে যখন এসে প'ড়্‌বে-তখন দেখ্‌বে সকলই এক পথ, নান্যপন্থা।

যে নীচু ভূমিতে রয়েছে, সেই জমির ও তাহার উঁচু নীচু আইলের বিভাগ প্রভৃতি বিকৃতি দে'খে থাকে। কিন্তু যে উচ্চ ভূমিতে, পর্ব্বত শিখরে, সে দেখে, সব সমান এক রূপ, কোন ও প্রভেদ নাই। দেখ্‌ছ না, এই আমি তোমাদের পাগলা ঠাকুর। তোমরা কেউ আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ভাব্‌ছ, কেউ রামকৃষ্ণ ভাব্‌ছ, কেউ চৈতন্য ভাব্‌ছ, কেউ কালী, কেউ শিব, কেউ পিতা, কেউ মাতা, কেউ বন্ধু, প্রভু প্রভৃতি যার যার রুচি অনুসারে ভেবে ভেবে এগোচ্ছো কিন্তু যখন একটু উচ্চভাবে—যখন কীর্ত্তনে তোমাদের একটু ভাব হয়, তখন আর, বিভিন্ন রুচিটুচি থাকে না, দেখো সকলেই এক, এক অনন্ত-অব্যক্ত চৈতন্যময় সত্ত্বা স্বরূপ। তখন আর আমি তুমি সে প্রভৃতি দ্বৈত জ্ঞান থাকে না, থাকে শুধু সর্ব্ব ব্যাপী এক সত্য ভাব। পরে এমন হয় যে এক বোধ ও লোপ পেয়ে যায়, কি যেন কি যে ভাব হয় তা বলা যায় না। ভাষায় তাহা ব্রহ্ম ভাব রূপে আভাষে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হয় মাত্র। অতএব উদ্দেশ্য-মূলবস্তু যখন এক, সকলেরই গমন গন্তব্য এক স্থানে, কেউ আশু আর কেউ ধীরে যাচ্ছে, তখন যেতে দাও, যেতে থাকো। কারু ভাব নষ্ট ক'রো না। যে, যে ভাবে যায় থাক্‌; যাওয়া বন্ধ ক'রো না, বরং যার যার ভাবে থেকে, যার যার নৌকায় থেকে গল্পগুজব ক'রে ক'রে আরামে চল্‌তে থাকো, পরস্পরকে চলার পথে সাহায্য কর; ইহাই ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের কয়েকটি সাধারণ বা স্বাভাবিক সত্য আছে। যা আবহমান কাল হ'তে—ধর্ম্মকে যে, সে নাম দিয়েই প্রচার করুক না কেন, ঐ স্বাভাবিক

ধর্ম্মের কয়েকটি সাধারণ সত্য।

স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞাগুলিই তাদের একমাত্র ভিত্তি। পার্থক্য কেবল, দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী বাইরের রং ফলান মাত্র। আর এতেই না বোঝা গোঁড়া লোকদের মধ্যে যত গোলের সৃষ্টি" হ'য়েছে। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম মতের সৃষ্টি হ'য়েছে, উহাদের প্রত্যেকটিরই মূল মন্ত্র—সত্য বীর্য্য রক্ষা করা, জ্ঞান ভক্তি-প্রেম লাভ করা, পবিত্রতা-মুক্ত ভাব পোষণ করা, নিয়ত নিষ্কাম কর্ম্ম করা, তাঁতে—যা হতে এসেছ, তাতে পুনঃ মিলে তাঁই হ'য়ে যাওয়া। এই প্রেম-ভাব-সমাধি—ভগবানে পুনঃ ফিরে যাওয়াই সকল ধর্ম্মের সকল প্রাণীরই এক মাত্র উদ্দেশ্য। এর পর আর নেই। এই সত্যই বার বার পুরণ নূতন, নূতন-পুরণ আকারে ঘুরে ফিরে আসছে। ভাঙ্গাগড়াই রহস্য, সেই চক্রধারীর গূঢ়চক্রান্ত

"আমি করি খেলা-শক্তিরূপা মম মায়া সনে,
একা আমি হই বহু, দেখিতে আপন রূপ!
" হরিবল্ হরিবল্ ওম্!!

ও.গো, দেখছ না, ঐ মুক্ত সুনাল স্বচ্ছ আকাশে কেমন" খোলা হাওয়ায় পাখী গুলো ভেসে বেড়াচ্ছে! আঃ! কী আরাম! যেদিন ঐরূপ, খোলা হাওয়ায় স্বাধীন ভাবে স্বাধীন আনন্দে নর-নারীরা সকলে ভেসে বেড়াতে শিখবে, জানবে, কেবল সেইদিন—সেইদিনই ধর্ম্ম রাজ্যে নেবেছ জানবে.

ধর্ম্ম প্রচার। তাঁর কথাই ধর্ম্ম কথা। তাঁর কথা, তাঁর কাজ, তাঁর ভাব বিস্তার ই ধর্ম্ম প্রচার। সেই নিজস্ব অনন্ত সদ্ভাব জাগরণ করাই সকলজীবের উদ্দেশ্য, আবার ঐ বিষয়ে অন্যকে সাহায্য

করাতেই নিজের চৈতন্য জাগরিত হ'য়ে থাকে। প্রচারের ইহাই উদ্দেশ্য। পরের উপকারেই নিজের উপকার হয়। পর কে? তোমারই ত সব বিভিন্ন রূপ। পর শ্রেষ্ঠ পর ব্রহ্ম।

একদিন বাড়ীতে আস্তে দেখে জয়দেবী (শ্রীশ্রীঠাকুরের কন্যা) 'বাবা, বাবা" ব'লে এসে জড়ায়ে ধরেছে। তার সঙ্গে একটি বালক খেলা কচ্ছিল, সে ও এসেছে। জয়দেবী নিজে যেমন 'বাবা, বাবা' ব'লে আনন্দ প্রকাশ ক'চ্ছে, তেমন তার সঙ্গী বালকটীকে ও বলছে "তুই ও বল্, বাবা এসেছে, বাবা এসেছে।" তার ভাব দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে গেলাম! তার বাবা নয় সে ব'ল্বে কেন? "বাবা, বাবা" ব'লে যে আনন্দ জয়দেবী পাচ্ছে, তা সাম্‌লে রাখ্‌তে পাচ্ছেনা; সে আনন্দের অংশ সঙ্গীকে না দিতে পার্‌লে যেন তার আনন্দ পূর্ণ হয়না! সে একা পাবে কেন? সকলে পা'ক, সকলে পেলেই তার সকল পাওয়া হবে, সেইরূপ এই ব্রহ্মানন্দ-ধর্ম্ম জীব, সাধক নিজে পেয়ে অন্যকে ও না পাওয়াতে পার্‌লে তার পাওয়া—আনন্দ পূর্ণ হয় না, সাধ মিটেনা এ ভাব সবাই পা'ক গো, সবাই পা'ক!

বৃন্দাবনে ব্রজগোপীদের ছিল নিষ্কাম প্রেম ভাব। তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পতিজ্ঞানে—প্রভু জ্ঞানে যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে ভজনা করে সন্তুষ্ট হোত। তারা প্রভুকে পেলে ভাব্‌ত অন্যে ও প্রভুকে পা'ক, পেয়ে আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি হো'ক। প্রভু এলে যদি কোন জন দূরে থাক্‌তো, তা হ'লে, তাকে ও ডেকে নিয়ে আস্‌তো। তাই পূর্ণানন্দোৎসব রাসলীলার দিনে সমস্ত গোপী সহ

শ্রীকৃষ্ণের মিলন না হ'লে রাস হোত না। সাধুরা ও তদ্রূপ ধর্ম্ম রস নিজে পেয়ে অন্যকে না দিতে পারলে সোয়াস্তি পায় না—সাধ, পূর্ণ হয় না, তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা প্রচারে বেরুতে বাধ্য হয়। প্রচার কর্ত্তে কর্ত্তে,—অন্যজনকে প্রকাশ কর্ত্তে কর্ত্তেই তাঁর স্বপ্রকাশ পূর্ণরূপে বিস্তার হয়ে যায়।

কিন্তু জেনো, ধর্ম্ম কথনো শুধু মুখে প্রচার করার বস্তু নয় কাজে প্রচার কর্ত্তে হয়। আমার রুদ্রানন্দই ছিল যথার্থ প্রচারক। কোন দিন মুখে একটা কথা ও বল্লে না, অথচ তার ভাব দেখে কাজ দেখে কত লোক শিক্ষা পেয়ে গেল, ত'রে গেল। অমূল্য ব্রহ্ম বস্তু পেয়ে ধন্য হয়ে গেল!

প্রচার সোজা কথা! যে সম্পূর্ণ আত্ম-ত্যাগী হ'য়েছে, অহমিকা ভাব একেবারে শূন্য হ'য়েছে, সেইই প্রচারের উপযুক্ত হ'য়েছে জানবে। যে চায় না সেইই দিতে পারে। চাওয়া থাকতে দেওয়া যায় না। তবে দেওয়ার অভ্যাস কর্ত্তে কর্ত্তে আবার অনেক জায়-গায় চাওয়া ও বন্ধ হ'য়ে যায়। যে যথার্থ ত্যাগী, প্রকৃত ভাবুক, তার কোন সময়েই ভাবের অভাব হয় না। সে যা কর্ব্বে, যা বলবে রাজা-প্রজা-পণ্ডিত-মূর্খ শুনবে, একবাক্যে নত শিরে স্বীকার কর্ব্বে, মানবে। কিন্তু যার মূলে কিছু নাই, কূলে থপ্‌থপি, তার কথা কেই বা মানে, আর কেই বা শুনে!

ধর্ম্ম-বড় গুহ্য বস্তুরে! ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। সদ্‌গুরুর নিকটই মাত্র উহার গুহ্য বিষয় গোপনে পেতে হয়। গুরু যারে তারে উহা দেন না। দেওয়াও ঠিক নয়। কারণ যে, যে জিনিষের

কদর না বোঝে, যে, যে বস্তুর মর্ম্ম না জানে, তারে সে জিনিষ দিলে উহার অপব্যবহারই হয়ে থাকে। ওতে নিজের ক্ষতি, অন্যেরও ক্ষতি হয়। যৈছা ক্ষেত্র তৈছা বীজ চাই। যে যেরূপ ভাবের, তারে সেই রূপ ভাবের উপদেশ দিবে। কিন্তু সাবধান, যেন ভিতরে অহংভাব না আসে, নিজে নিজে জগদ্ কর্ত্তা হয়ে না বসে। তাহলে ক্ষেতের তা ও যাবে, হাতের পাঁচ ও যাবে। তাঁর কায়, তাঁরই এযন্ত্র, তিনিই এর ভিতর দিয়ে ক'রে যাচ্ছেন, ভাল হ'লে ও তিনি, মন্দ হ'লে ও তিনি, তিনিই সব কচ্ছেন। তাঁরই সব লীলা!

কর্ম্মযোগ বা কর্ম্ম রহস্য ।

কর্ম্ম কি। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

কর্ম্মেই তোমার অধিকার ফলে কভু নয়। আসক্তি শূন্য হ'য়ে পরোপকারের জন্য যা কিছু চেষ্টাকর, তাহাই কর্ম্ম। বাকী সব অকর্ম্ম। মনে কাম রেখে কিছু কত্তে গেলেই বন্ধনে পড়তে হয়; যা বন্ধন হ'তে মুক্তি এনে দেয়, তাহাই কর্ম্ম। জ্ঞানীরা যেখানে জ্ঞানের দ্বারা, ভক্তেরা যেখানে ভক্তিদ্বারা, যোগীরা যেখানে যোগ দ্বারা উপস্থিত হয়, একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মীরাও সেইখানে উপস্থিত হ'য়ে থাকে। কর্ম্মই চেষ্টা, কর্ম্মই সঞ্জীবতা, নিষ্কর্ম্মতাই মৃত্যু।

কর্ম্মে সবাই সমান। যার সাম্‌নে যে কাজ প'ড়্‌বে, যে আজীবন যে কাজ ক'রে আস্‌ছে, তা সুন্দররূপে সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করাই তার কর্ত্তব্য। যে রাজ কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছে, তার রাজ

কর্ম্ম, প্রজা পালনই কর্ত্তব্য। যে মেথর, তার ময়লা পরিষ্কার ক'রে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এরূপ কৃষকের কৃষিকর্ম্ম, ব্যবসায়ীর ব্যবসায় কর্ম্ম সম্পন্ন দ্বারা জন সাধারণের—গণ-নারায়ণের সেবা করাই কর্ত্তব্যকর্ম্ম। সংসারীর সংসারীর কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যার যে কর্ত্তব্যই হোক না কেন কর্ত্তব্য ফুরালেই—কর্ম্ম শেষ হলেই মুক্তি-মোক্ষলাভ।

তোমরা পড়েছত, একবার শেরশাহের আক্রমণে মোগল বাদ্‌সা হুমায়ুন গঙ্গা ঝাঁপিয়ে পালাবার সময় যখন ক্লান্ত হ'য়ে ডুবে যায় যায় এমন অবস্থা হয়েছিল, তখন তা দেখে এক জেলে দয়াপরবশ হ'য়ে, তাকে ডিঙ্গায় তুলে পর পারে নিয়ে দিলে, বাদ্‌সা প্রাণ পেয়ে তাকে বল্লে—"আমি মোগল বাদ্‌সা, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ, সেজন্য তুমি আজ আমার নিকট যা চা'বে, তাই তোমাকে দিয়ে দিব। তুমি আমার নিকট এখন কিছু চাও? সে জেলে এক দুষ্টের পরামর্শ শুনে চাইলে, "যদি তাইই হয়, তবে তোমার সিংহাসনে ব'সে আমি তিন দিন রাজা হ'য়ে রাজত্ব কর্ব্বো, এই আমায় ক'রে দাও।" তাই হ'বে ব'লে বাদসা তাকে নিয়ে রাজধানীতে চ'লে এলেন এবং তাকে রাজাসনে বসায়ে দিলেন। ছত্রধর ছত্র ধ'রলে, পাত্র মিত্র অমাত্যেরা চা'রদিকে ঘিরে বস্‌লে, নর্ত্তকীরা নৃত্য করতে লাগ্‌লে দাসদাসীরা করজোড়ে আজ্ঞার আশায় র'লো। আর সঙ্গে সঙ্গে এ নালিশ সে নালিশ এসে পড়্‌তে লাগ্‌ল—অমুক আমার গাভী ক'রেছে, অমুক অমুককে প্রহার ক'রেছে, অমুক কর

দেয়না, অমুক রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি সব দেখে শুনে তার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত; সে ভেবেছিল রাজার মত বুঝি কেউ সুখী নাই। মাছ ধরা বেচা হতে রাজত্ব করা বুঝি ভারি সুখের বিষয়। কেবল কতকগুলো রাণী নিয়ে আমোদ প্রমোদ করা, ভাল ভাল খাবার খাওয়া, আর দিনরাত নানা গল্প গুজবে শুয়ে ব'সে কাটান! কিন্তু এ কি উৎপাত। এত বিচারাবিচার, টানাখেচা হেঙ্গাম কেন হে? এর থেকে ত আমার সেই মাছ ধরা বেচাই শত গুণে ভাল। কোনও জঞ্জাল নাই, ধর্‌লাম, বেচ্‌লাম, খেলাম, সুখে নিদ্রা গেলাম। এ কি? এ খেতে সময় নাই, শুতে সময় নাই, এত কি এক জনে পারে? এ আমি পার্ব্বো না এ আমার সাজে না। এক দিনেই তার রাজত্বের সখ মিটে গেল। রাজার পায়ে পড়ে এসে বল্লে মহারাজ আমার অন্যায় হয়েছে, ক্ষমা কর, তোমার কাজ তুমি কর, আমাকে বিদায় দাও। আমার কাজই আমার ভাল, তোমার কাজও তোমারই ভাল। ব'লে প্রণাম করে দৌড়ায়ে এসে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

রাজারও তদ্রূপ নৌকাচালা, মাছধরা প্রভৃতি মহাবিপজ্জনক। বস্তুতঃ যার যা কাজ, যার যা সাজে, তার তা-ই কায়-মনবাক্যে উত্তমরূপে পূর্ণরূপে সম্পন্ন করাই তার কর্ত্তব্য। মহারাজ, কবিরাজ, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, ঝাড়ুদার, সরদার, সবই চাই, সকলেরই সকলের প্রয়োজন। কেউ না হলে কেউ বাঁচতে পারে না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র সকলই পৃথিবীতে দরকার।

যে দেশে যখন এর একটির ও অভাব হয়, তখন সে দেশে নানা বিশৃঙ্খলা এসে শীঘ্রই ধ্বংসের দিকে চ'লে যায়। জগতের কীট পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেই সকলের উপর নির্ভর ক'রে বেঁচে থাকে। এ ওকে সাহায্য করে, সে আবার অন্যকে সাহায্য করে, এ ওকে খেয়ে, সে আবার তাকে খেয়েই বেঁচে থাকে। সারা দুনিয়াই এইরূপে পরস্পরেব সাহায্যে চল্‌ছে। যেদিন এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে, জাতি বন্ধ হয়ে যাবে, সেই দিনই সৃষ্টি ধ্বংস হযে যাবে। তাই জেনো—কোন কর্ম্মই ছোট বা বড় নয়। কর্ত্তব্য সম্পন্নতা নিয়েই বড় ছোটব কথা। যে যা ধরে আছ, সম্পূর্ণরূপে তা করে যাও, করে শেষ কর, মুক্ত হও। ইহাই কর্ম্মের রহস্য।

বর্ত্তমান মানব সমাজের কর্ম্ম আবার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক গৃহ কর্ম্ম, আর সন্ন্যাস কর্ম্ম। সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য—মায়া মমতা, ঘৃণা লজ্জা ভয়, ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সমস্ত একেবারে ত্যাগ ক'রে তিতিক্ষু হ'য়ে অটুট সংযমী হ'য়ে বিরাগ-বিবেকী হ'য়ে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জীবন পরের জন্য চিরউৎসর্গ করা, যাতে সর্ব্ব লোকের সর্ব্বজীবের ইহ-পরকালের উন্নতি হয় তার চেষ্টা করা। পরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে—বলি দিয়ে দেশ পরিভ্রমণ করা। একমাত্র ত্যাগ ও সেবা ব্রত নিয়েই সে মুক্তির পথে ধা'বে। বড় কঠিন কর্ম্ম, বড় কঠিন কর্ত্তব্য।

কিন্তু গৃহস্থের কর্ত্তব্য আরো কঠিন। নিজে কর্ত্তা সেজে ও

কর্ত্তা হয়ে সেবক হয়ে পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগ্নী, স্বামী স্ত্রী, আত্মীয়বান্ধব, অতিথি প্রভৃতির ভরণপোষণ ও মনস্তুষ্টি-সাধন কর্ত্তে হবে। পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। দেশ দশের উন্নতি বিধানে যথাসাধ্য যত্ন কর্ত্তে হবে। আবার নিজেকে অনাসক্ত নির্লিপ্ত রাখ্‌তে হবে। তবে জেনো—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।"

যে যেটা ধরে আছো, ধরে থাকো। এটা ফেলে ওটা, ওটা ফেলে সেটা করে বেড়ায়ো না। সন্ন্যাস নিযে থাকোত সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য করে যাও, আর গৃহী সেজে থাকোত গৃহস্থের কর্ত্তব্য করে যাও। মেয়ের কাজ মেয়ে, পুরুষের কাজ পুরুষে করো। জীবনের সময় বড় অল্প, নাড়াচাড়া করে এ অমূল্য জীবন নষ্ট করো না।

কর্ম্মে শক্তি নেমে আসে।

যে কর্ম্ম করে তার নিকট শক্তি আপনিই নেমে আসে। তাকে চেয়ে নিতে হয় না। যেখানে যার ব্যবহার হয়, সেইখানেই তা গিয়ে জড় হয়ে থাকে। কুঁড়ে অলসের নিকট কি কিছু যায়? শক্তির ব্যবহার যে করে, তাকেই সে আদরে। শাক্তের নিকটই থাকে শক্তি। তুমি এই দেশের যত ক্ষুধিতের মুখে অন্ন, মূর্খের মস্তিষ্কে জ্ঞান আর আর্ত্তের ত্রাণের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে ঝেঁপে পড়ো দেখি, শক্তি তোমা ছাড়া হয়ে কোথা থাকে? দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, জনশক্তি, জ্ঞানশক্তি সব এসে হাজির হবে, জ্ঞান-ভক্তি-মোক্ষ পর্য্যন্ত এসে যাবে। আসল কথা হচ্ছে—কাজ। কাজ কর,

আমাকে ক্ষণমুহূর্ত্ত ও কাজ ছাড়া দেখ কি? কাজ না কল্লেও কি আমি কোন অভাবে পড়ি? কিন্তু তা হয় না, আমি তা পারি না। কাজেই আমার আনন্দ। কাজ কত্তেই এসেছি, কাজ করেই যাবো। যখন রাত্রে দু' এক ঘণ্টা সময় পাই, তখন তোমরা ভাব—কেউ কেউ যে আমি ঘুমুচ্ছি? কিন্তু ঘুম হয় না, ঘুম আসে না। ঐ সময় একটু অবসর পেয়ে কে কোথায় কি কচ্ছে না কচ্ছে, কে কোন বিপদে পোল, কে কি কল্লো, এ সব দেখি, চিন্তা করি। স্থূল শরীরটা এখানে থাক্‌লে ও সূক্ষ্ম শরীরে গিয়ে তাদের চৈতন্য করে দি, তাদের হয়ে করে আসি। কর্ম্ম কর্ম্ম-হে! কর্ম্মই সবার মূল।

এই কর্ম্ম যখন জীবের শেষ হয়ে যাবে, তখনই মুক্তি—জীবন্মুক্তি। তখন বিশ্বাত্মায় অভেদ হয়ে আত্ম-তৃপ্তিতে বিভোর হয়ে যাবে। কোন কর্ম্মই আর থাক্‌বে না। কর্ম্ম সমাধা হলেই সমাধি, মহানির্ব্বাণ।

কর্ম্মে অনাসক্তই আত্মত্যাগ, আত্মত্যাগই মুক্তি।

আসক্তিশূণ্য কর্ম্ম কেমন জানো? যেমন কারু কারু মুদ্রাদোষ থাকে। একদিকে মন রয়েছে, অথচ হাত দিয়ে নখ খুড়্‌লে কি পাতা ছিঁড়্‌লে, পা নাচালে ইত্যাদি। আবার কৃষকদের দেখ্‌বে—তারা হাতে কাজ কচ্ছে, আবার গল্প কি গান কচ্ছে মুখে। তখন তাদের মন থাকে ঐ গানে বা গল্পে, কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কাজ হয়ে যাচ্ছে। কোনও ব্যাঘাত হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় তারা কর্ম্মে আসক্তি না রেখে করে যাচ্ছে। তবে তাদের মন ঐ গল্পে কি

গানের সু-কু-ভাবের মধ্যে সু-কু ভাবে বিভোর হ'য়ে আছে। আর যখন ঐ মন কি আত্মা কীর্ত্তনে বিভোর হ'য়ে একেবারে তন্ময় হয়, তখন সু-কু-র পারে চ'লে যায়, তুমি আমি তার বোধ থাকে না, অনন্ত-অদ্বয় আত্মায় আত্মস্থ হ'য়ে যায়। তখনই তাকে বলে আত্ম-ত্যাগ, আর উহাকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে।

এইরূপে সমস্ত কর্ম্ম যে অনাসক্ত ভাবে, ভাসা ভাসা রূপে ক'রে যায়, তারই জীবন্মুক্তি বা পরামুক্তি লাভ হয়। যে একবার গা ভাসান দিতে শিখেছ, সে আর বদ্ধ আসক্তির দিকে যেওনা। ক্রমশঃ ভাসা ভাসা, আল্‌গা আল্‌গা হ'য়ে যাও! সাক্ষীবৎ হ'য়ে যাও!

কর্ম্ম ফল।

অন্তরে কামনা রেখে যা কিছু কর্ব্বে তার ফলভোগ কর্ত্তেই হবে। তা এজন্মেই হোক, পরজন্মেই হোক, বা দু'দিন আগু পিছুই হোক, ভোগ আস্‌বেই। অন্তরপটে কামরেখার দাগ প'ড়ে যায় কিনা। যদি কৌশলে ঐ রেখার দাগ পড়াতে না পারে, তবেই বেঁচে যাওয়া যায়। এই দাগ এড়াবার কৌশলে সুকৌশলী

শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ,
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।"

হে কৌন্তেয়, যা আহার কর, পূজা কর, দান কর, তপস্যাদি যা-যাই কর, সমস্তই আমাতে সমর্পণ ক'রে কর, তোমার প্রভুতে

সমর্পণ ক'রে কর, সেই অনন্ত সত্ত্বার হ'য়ে ক'রে যাও, গায়ে কোন দাগ লাগ্‌বে না।

হাতে তেলমেখে কাঁঠালের ভিতর হইতে কোষ বে'র ক'রে নিলে যেমন হাতে ওর কোন দাগ লাগে না, তদ্রূপ এই বিশাল জটিল রহস্যময়-কণ্টকপরিপূর্ণ কর্ম্ম জগৎ হ'তে মুক্তিকোষ বে'র ক'রে নিতে হ'লে, আগে অকামনারূপ—তাঁতে সমর্পণরূপ-তেল মনে মালিশ ক'রে নেও, তবে ওর আঠায় বদ্ধ ক'রে ফেল্‌তে পার্ব্বে না।

ওগো চিন্তা কিসের? প্রভুর হ'য়ে কার্য্য ক'রে যাও। ফলাফল, লাভালাভ সেই মাহাজনের। তাঁর রাজ্যে আমি তাঁর হ'য়ে স্বাধীন ভাবে বিচরণ কর্ত্তে পাচ্ছি, এর চেয়ে আর কি চাই? হিসাব-নিকাশে আমার কোন দরকার নাই, খাট্‌তে এসেছি খেটে যাই। পাখীর মত বাহু বিস্তার ক'রে অনন্ত-মুক্তাকাশে ভেসে যাও। তুমি যে নিত্যমুক্ত, নিত্য-স্বভাব, নিত্যানন্দময়!

বীর্য্য ও সত্য রক্ষা।

যেখানে বীর্য্য সেখানেই সত্য, যেখানে সত্য সেখানেই প্রেম, প্রেম স্বরূপই ভগবান্।

বীর্য্যের ওপর সত্য প্রতিষ্ঠিত।

বীর্য্যই বল শক্তি। বীর্য্যই শরীরের কেন্দ্র স্বরূপ ধাতু। এই বীর্য্য না থাক্‌লে শরীর থাকে না। শরীরের সুস্থতা, সবলতা, সমতা একমাত্র বীর্য্যের ওপরই নির্ভর করে। খাদ্য দ্রব্য সাতবার ছেকে ছেকে যেয়ে এই বীর্য্যতে দাঁড়ায়। এর পরে মস্তিষ্ক,—মস্তিষ্কের পরে মন, মনের'পরে তবে আত্মা বিরাজ করেন।

এই স্থূল ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্থূলদেহের'পর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সমন্বিত মনোরূপ সূক্ষ্মদেহ প্রতিষ্ঠিত। তার ওপরে আত্মা। জীবিতকাল পর্য্যন্ত দেহের সহিত মনের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, দেহ দুর্ব্বল ও অসুস্থ হ'লে মনও দুর্ব্বল ও অসুস্থ হয়। দেহ সতেজ ও পবিত্র থাক্‌লে মনও সতেজ ও পবিত্র থাকে। মনের সম্বন্ধে ও তাই, মন সতেজ ও পবিত্র থাক্‌লে দেহ ও সতেজ ও পবিত্র থাকে। বস্তুতঃ মনের বিকারে শরীরের বিকার, আবার শরীরের বিকারে মনের ও বিকার এসে পড়ে।

শরীরের মূলবস্তু বীর্য্য। যার এই বীর্য্য অটুট থাকে, তার শরীর ও অটুট—স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকে। শরীর ঠিক থাক্‌লে মনও

ঠিক থাকে। মন ঠিক থাকলে বাক্যও ঠিক রাখতে পারে। এই বীর্য্যের ওপরই যে সত্যের প্রতিষ্ঠা; তাই সত্যরক্ষা কর্ত্তে হলে আগে বীর্য্যরক্ষা কর্ত্তে হবে, ব্রহ্মচারী হতে হবে, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্ত্তে হবে। দেখা যায়—যে সবল, ক্ষমতাবান্, যার কিছু কর্ব্বার শক্তি আছে, সেইই মাত্র সত্য ঠিক রাখতে পারে। যে দুর্ব্বল, সে চঞ্চল। চঞ্চল ব্যক্তির মন ও চঞ্চল, সে কোন বিষয় বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না, তা সত্য-ধর্ম্ম মুখের বাক্য ঠিক রাখবে কেমন করে? দেখছ না, যারা সর্দ্দার, বীর জিতেন্দ্রিয়, যোদ্ধা, তারাই সত্যবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক হয়ে থাকে। সেই সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে পেতে হলে আগে ক্ষত্রিয় হতে হবে, বীর-মহাবীর হতে হবে। তবে ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় না হয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। দ্বাপর যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ভীম। তাই সে আশ্রিত দণ্ডীকে রক্ষা করার সত্য দিয়ে, সেই সত্য রক্ষার জন্য স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও ধর্ম্ম যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিল। দুর্ব্বলের কি কাজ হে? চাই বলবান্, বীর্য্যবান্, মহাশক্তির বিকাশ।

এই এখনো তোমরা যাদের পূজো কচ্ছ, ধ্যান কচ্ছ, সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবদেবীদের প্রতিমূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখো দেখি! কয় জনে তাদের অনুকরণ কচ্ছ? প্রকৃত পূজো কচ্ছ! তাদের প্রতিমূর্ত্তিগুলি যে অনন্ত বলের, অনন্ত শৌর্য্যবীর্য্যের আধার, অনন্ত প্রতিভার, অনন্ত শক্তির বিকাশ। ন্যাভাচেভার কাজ নয় গো! যাদের জীবন নিয়েই বেঁচে থাকবার শক্তি নাই, তারা

আবার সেই অনন্ত শক্তিময়কে পাবে কেমন করে! সে যে ওজঃস্বরূপ, তেজঃস্বরূপ, অনন্ত বলস্বরূপ। আমাকে মান্‌তে তোমাদের কাউকে কভু বলি না, বলি আমার কথা শুন্‌তে, কথা মত কাজ কর্ত্তে, আমার কার্য্যের অনুকরণ কর্ত্তে। যা ভাব্‌বে, যা বল্‌বে, ত কার্য্যে পরিণত কর্ব্বে। তুচ্ছ প্রাণ যায় যাক্। এক দিন ত যাবেই তবে সত্যকে নষ্ট কর্ব্বো কেন! মরিয়া হ'য়ে লেগে যাও। বলবান্ হও, অভী হও, সত্যবান্ হও, সত্য স্বরূপ তাঁতে লীন হও, ইহাই ধর্ম্ম।

বীর্য্য রক্ষা কর্ব্বার উপায়, ঐ সম্বন্ধে নানা কথা।

এই দেহের মূলবস্তু বীর্য্য রক্ষার জন্য অনেকে অনেক রকম কৃত্রিম ও কঠোর নিয়মাদি পালন ক'রে থাকে। ঐ সব নিয়মে ইন্দ্রিয়জনিত চিন্তাই বেশী। ফলে সুফল না হ'য়ে কুফলই হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য ভালই হোক, আর মন্দই হোক, যে বিষয়ে যত চিন্তা করা যায়, উহা ততই বেড়ে গিয়ে থাকে। কামেন্দ্রিয় দমন কর্ত্তে চিন্তা করায় উহা ও ক্রমশঃই বেড়ে যাবে। তাই, ওসব ত্যাগ ক'রে সৎ পবিত্র বিষয়ের চিন্তা কর, ধ্যান কর; তাতে সৎ ও পবিত্র হবে। কামের পাল্লা ও দেখা যাবে না। লিঙ্গটা ত একটা দ্বার স্বরূপ। যেমন নাক-কান-চোখ-মুখ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস খাওয়া দাওয়া দেখা শোনা প্রভৃতি ক্রিয়া ও চলে, আবার কফ্ কাশি, খোল প্রভৃতি পচা মল ও সময় সময় বের হয়ে যেয়ে থাকে; তদ্রূপ লিঙ্গ দ্বারা প্রস্রাব নিঃসরণের ক্রিয়া চলে, আবার সময় সময় হয়ত একটু বীর্য্য ও বের হ'য়ে যায়।

আর প্রস্রাবের সঙ্গে বিন্দু বিন্দু বীর্য্যপাত ত নিয়ত হচ্ছেই; তবে আর ও বিষয়ে অত লক্ষ্য রাখার কি আছে? এ ত্যাগ নিঃসরণ ত সর্ব্ব প্রাণীরই স্বাভাবিক-শারীরিক ধর্ম্ম। তবে উহা রক্ষা কর্ত্তে হলে কৌশলে প্রকৃতির সহিত লড়াই করে জিত্তে হয়। ঐ বিষয়ে, ইন্দ্রিয় জনিত কাম বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও সংযত থাক্তে হয়। আর সত্য বিষয়ে এত চিন্তা কর্ত্তে হয় যে ও চিন্তা যেন স্বপ্নে ও আস্তে সময় না পায়। কাম (কর্ম্ম) না থাক্লেই কাম আসে। সর্ব্বদা কাজ নিয়ে থাক্বে, তবেই কাম আস্তে ফুর্সুদ্ পাবে না, আপনা হতেই দমে যাবে। এই তোমরা এখানে ২০।২৫ জন বসে সৎকথা আলোচনায় আছ। যে ১ ঘণ্টা প্রস্রাব না করে থাক্তে পারে না, সে এখানে এখন এমনই তন্ময় হয়ে আছে যে, এই ৪।৫ ঘণ্টা কাটিয়ে গেল। ও বিষয় মনেই নাই। যাই এই মনে হোল, অম্নি দেখ ঐ ওরা কয়জনে না উঠে আর থাক্তে পার্লে না, উঠে গেল। কারণ এখন মন বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐখানে গিয়ে পড়েছে। কীর্ত্তনে, ধ্যানে, যুদ্ধে প্রভৃতি তন্ময়ের ভাবে এ সব হয়ে থাকে। অর্থাৎ যতদিন উহা রক্ষা কর্ত্তে না পার্ব্বে, ততদিন এত কর্ম্ম কর্ব্বে, এত নাম কর্ব্বে, সাধুসঙ্গ কর্ব্বে, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কর্ব্বে যে, ইন্দ্রিয় জনিত চিন্তা, পুরুষের স্ত্রী বিষয়ক, স্ত্রীর পুরুষ বিষয়ক চিন্তা মনে আদৌ স্থান না পায়, সময়ের ফাঁক না পায়। তবেই ঠিক হয়ে যায়। ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্ত্তে পারো, তবে আর ভয় নাই। তারপর বীর্য্য এমন গাঢ় হয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় যে, ইচ্ছা

না কুলে আর টলে না। আর অত কেন হে! তুমি ত শরীর নও। তুমি যে আত্মা, অনন্তশক্তি আত্মা, নির্ব্বিকার চৈতন্য স্বরূপ আত্মা হুহুঙ্কার রবে উন্মুক্ত দুনিয়ায় চরে বেড়াও! সব পালায়ে যাবে। তুমি যে মহাবীর! মহান্ আত্মা! আত্মার আবার কাম ক্রোধ আছে নাকি হে? আত্মা আবার কিছুর বাধ্য নাকি? সে যে স্বাধীন—সে যে পূর্ণ মুক্ত—পূর্ণ শুদ্ধ।

ছেলে মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে মাতাপিতাই সম্পূর্ণ দায়ী। এক পণ্ডিত বলেছিলো—মাতাপিতা স্বর্গ হতে এই নিষ্পাপ আত্মা এই নরলোকে টেনে আনে, আর গুরু তাকে চৈতন্য করিয়ে পুনঃ স্বস্থানে পাঠিয়ে দেয়। তাই পিতামাতা হতে গুরুই অধিক পূজ্য। খাটিকথা, ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান-গণের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া, আর ঐ কাল পর্য্যন্ত নিজেদের অথবা উপযুক্ত গুরুর নিকটে রেখে চরিত্রবান্ করা ব্রহ্মচারী করা প্রত্যেক পিতামাতারই অবশ্য কর্ত্তব্য। তবেই সেই পূতঃ পুত্র-পুত্রীর পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা পুন্নামক নরক হতে উদ্ধারের আশা করা যায়; নতুবা শুধু গণ্ডায় গণ্ডায় কিচকের দল সৃষ্টি করলে, বরং নরকের দ্বার আরো প্রশস্ত করা হয়।

যৌবন নদীর প্রথম বেগ যদি একবার শান্ত হয়ে যায়, তবে আর ভাঙ্গার ভয় থাকেনা। কিন্তু প্রথমেই যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তবে আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এসেও তাকে ঠেকাতে পারেনা। যে মানুষ হয়, সে ছোট হতেই মানুষ হয়। জগতে যত যত মহাপুরুষ জন্মেছেন, বাল্য হতেই তাঁদের জীবন-চরিত্র তৈরী হয়ে

এসেছে। ২০ বৎসর পর্য্যন্তও যারা অটুট ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্ত্তে পারে, কালে তারা ও চেষ্টা কল্লে মানুষ হতে, মুক্ত হতে পারে, অন্যজনকেও মুক্ত করতে পারে। বিন্দুসুখ, ক্ষনসুখ চেওনা। অনন্ত অসীম শান্তি সমুদ্রে ঝাঁপ দাও।—

ক্ষণেক সুখের তরে স্বাস্থ্য ভঙ্গ যেই করে
অকালে জীবনে মরে সেই মূর্খ হীন।
মাতৃজাতি মাতৃভাবি পিতৃজাতি পিতৃভাবি
সচ্চরিত্র সদা রবি,
না হইবি সর্ব্বনাশা নেশার অধীন॥

সত্য মানুষকে দেবতা করে।

সত্য মানুষকে দেবতা করে। দেবতা আর কে? যার বাক্য সত্য, চিন্তা সত্য, কার্য্য সত্য, সেইই সৎ, সেইই দেবতা। সত্যের সমান তপঃ নাই, মিথ্যার সমান পাপ নাই।—

"সাঁচ বরোবর তপ নহি, ঝুট বরাবর পাপ,
জাকো ভিতর সাঁচ হৈ, তাকো ভিতর আপ্।"

যাঁর ভিতর সত্য বিরাজ করে, তার মধ্যে তিনি আপনি বিরাজ করেন। যে সর্ব্বদা সত্য চিন্তা করে, সত্য বলে, সে এমনই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, সে সত্য বই আর কিছুই দেখ্‌তে পায় না। তার তখন "সত্যময়ম্ এ ব্রহ্মাণ্ড" দৃষ্ট হয়। এই রূপেই সে সত্যস্বরূপে সত্যময় হয়ে যায়। এই সত্যাচার, সত্যানুষ্ঠান কর্ত্তে কর্ত্তেই সাধুদের বাক্‌সিদ্ধ হয়ে থাকে। তখন তাদের মনের জোর এত প্রবল হয় যে, ইচ্ছা মাত্র এই ধরাকে

ওল্‌ট্ পাল্‌ট্ করে দিতে পাবে। ধারণাশক্তি এত বেড়ে যায় যে, ভুল ক্রমে একটা মিথ্যা বিষয় ধর্‌লে ও তা সত্য হয়ে যায়। এক সময় কালিকানন্দ নামে জনৈক সাধু বহুকাল হিমালয়ের ক্রোড়ে থেকে সাধনা করে সিদ্ধ হয়ে একদিন যাই নিম্ন প্রদেশে এসেছে, অম্‌নি দেখে রেলগাড়ী যাচ্ছে। তাঁর হিমালয়ে গমনের সময় দেশে রেলগাড়ীর আবিষ্কার হয় নাই। তাই নূতন একটা বস্তু দেখে তার সখ হোল জিনিষটা কি যায় ভাল করে দেখি। আর যাই তার মনের মধ্যে ইচ্ছা হয়েছে "থাম্", অম্‌নি গাড়ী থেমে গেল। তখন সাধু গাড়ীতে উঠে সব কল-কব্জা ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে, চলে যাবার জন্য যাই আবার সঙ্কেত কল্লে অম্‌নি চলে গেল। এই ত তোমাদের মত কত কত মহাপুরুষ দয়াপরবশ হয়ে সত্যনিষ্ঠ মনের জোরে কত কাঙ্গাল জনের দুরারোগ্য ব্যাধি সকল আরোগ্য করে দেন, জীবন দান দিয়ে দেন। এসব মনের বলে, সত্য ইচ্ছাশক্তির বলে হয়ে যায়। ইচ্ছার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, বাক্যের সঙ্গে, কার্য্যের সঙ্গে, সত্যবল এমনভাবে প্রবিষ্ট যে স্বাধীনতা, পবিত্রতা, মুক্তি, প্রেম-সমাধি পর্য্যন্ত এনে দেয়।

ওগো, সৎ হও, সৎভাবো, সৎকার্য্য কর, সত্যময় এ জগৎ প্রত্যক্ষ কর। এ দুনিয়াটা যে একখানা বিরাট দর্পণস্বরূপ। এর সাম্‌নে যে সাজে, যে ভাবে, যা নিয়ে দাঁড়াবে—তাহাই দেখ্‌তে পাবে। যদি সৎ ও ভাল হও. সৎ ও ভাল বলেই একে দেখ্‌বে। আর অসৎ ও অসাধু হ'লে সবই তোমার নিকট

অসৎ ও অসাধু রূপে দেখা দেবে। ভাল চাও ত' আগে ভাল হও। ভাল না হইলে বাঁধবে বিষম লেঠা।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একবার সাধুসেবার আয়োজন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দাম্ভিক ভীম একজন সাধু আন্‌তে বেরুল। সারাদেশ খুঁজে খুঁজে একজন ও সাধু দেখ্‌তে না পেয়ে ফিরে এসে বিরক্ত হয়ে জানালে—"না কৃষ্ণ, সাধু পাওয়া গেল না। এদেশে সাধু নাই।" তখন শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বল্লেন "কি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে সাধু নাই? তুমি বল্লে কি?" তখন যুধিষ্ঠির স্বয়ং বাইরে গিয়েই সাম্‌নে রুহিদাস মুচিকে দেখে সাধু বলে ধরে আন্‌লেন। ভীম ঠাট্টা করে বল্লে—"মুচি যদি সাধু হয়, তবে আর এ দেশে অসাধু কে? আচ্ছা ধর্ম্মরাজ যখন সাধু বলে এনেছেন, তখন যদি সেবার সময় স্বর্গে ঘণ্টা বাজে তবে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং ধর্ম্মরাজের আদেশে সেবার আয়োজন হ'ল। রুহিদাস ভোজনে প্রবৃত্ত হ'ল, কিন্তু, কৈ ঘণ্টা ত বাজে না! শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—"তোমরা ওকে সাধু বলে বিশ্বাস করে সেবা করাচ্ছ না, তবে ঘণ্টা বাজ্‌বে কেন? সাধু সেবাইত হচ্ছে না। তখন যুধিষ্ঠিরের ধমকে সকলেই সাধু বলে বিশ্বাস কল্লে, কারণ ধর্ম্মরাজের বাক্য ত আর মিথ্যা নয়! নিশ্চয়ই উনি সাধু। তখন আবার পাক হোল, রুহিদাস আবার ভোজনে বস্‌ল, কিন্তু কৈ এবারও ত স্বর্গে ঘণ্টা বাজ্‌ল না। আবার শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—"সাধু বল্লেত সকলে মান্‌লে, কিন্তু দ্রৌপদী যে ওকে মুচিজ্ঞানে ঘৃণাভরে পাক করে খেতে দিলে।

তাই অশ্রদ্ধার সহিত ভোজন দেওয়ায় ঘণ্টা বাজ্‌ল না।" তখন আবার সকলে ভয়-ভক্তি বিহ্বল চিত্তে তাকে পুনঃ ভোজনে বসালে, আর গলবস্ত্রে সাধুদের স্তুতি-গুণগান কর্ত্তে আরম্ভ করে দিলে। এবার যাই রুহিদাস গ্রাস নিলে, অমনি ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, গ্রাসে গ্রাসে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। তখন সকলে কেন্দে কেন্দে সাধুনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে লাগ্‌ল। তাই জেনো— সাধু না হলে সাধুকে ধরা যায় না, চেনা যায় না। সৎ হও, সাধু হও! "সত্যমেব জয়তে"—সত্যের জয় চিরকালই।

জ্ঞান-যোগ।

আত্ম-বোধ।

এই আমরা হাত নাড়্‌ছি, কথা বল্‌ছি; মনে কত চিন্তা কচ্ছি, এতে আমাদের একটা শক্তি বা সত্ত্বা অনুভব হচ্ছে। যখন মৃত্যু হবে, ঐশক্তি বা সত্ত্বা দেহ ছেড়ে চলে যাবে. অথবা থাক্‌লেও প্রকাশ থাক্‌বে না, তখন এ দেহ হতে কেউ কথাও বল্‌বে না, নড়্‌চড়্‌ও কর্ব্বে না, কোন চিন্তাও কর্ব্বে না। এই স্বপ্রকাশ শক্তি বা সত্ত্বাকেই আত্মা বলে।

এই আত্মাকে কেউ দেখ্‌তেও পায় না, দেখাতেও পারে না। উহা ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য, মাত্র উপলব্ধি সাপেক্ষ। এই আত্মা অবিনশ্বর. নির্ব্বিকার, নিরাকার—সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতম। উহা সর্ব্বত্র, অথচ সর্ব্বশরীরে কেন্দ্ররূপে সদা বিদ্যমান।

পরমাত্মায় আর জীবাত্মায় তফাৎ কেমন ? যেমন এক অনন্ত অখণ্ড আকাশ। উহা ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ, মঠের মধ্যে মঠাকাশ, নাম প্রভৃতি ধরেছে, কিন্তু যেখানে গিয়ে উহার যে অংশ যে নামই ধরুক না কেন, উহা যে অনন্ত অখণ্ড আকাশ, সেই অখণ্ড আকাশই রয়েছে। ঘট-মঠ-পট ভেঙ্গে গেলেই প্রকাশ হয়ে পোল। জীবাত্মা পরমাত্মাও তদ্রূপ। উহা এক অনন্ত অখণ্ড। কেবল বাইরের মায়ার

আবরণে পৃথক্ দেখাচ্ছে। যখন ওর যে অংশ যে শরীরে আবদ্ধ হয়েছে, তাহাই তখন সেই শরীরের জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়েছে। মায়ার আবরণ খুলে গেলেই স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গেল। আপনত্বের স্বরূপ, জীবাত্মার স্বরূপ, উহার যে কোন এক দিকের এক অংশের একটু জ্ঞান হলেই সেই এক অখণ্ড পরমাত্মার জ্ঞান এসে পড়ে। এই জীবাত্মায় পরমাত্মায় একত্ব বোধ—একত্ব হওয়াই জীবনের চরমোদ্দেশ্য।

যার এই আত্ম-জ্ঞান জন্মেছে, উপলব্ধি হয়েছে, সে এ দেহটাকে আশ্রয় করে ও থাক্‌তে পারে, আবার উহা ত্যাগ করেও দিতে পারে। আত্ম-বোধ—আত্মোপলব্ধিই মুক্তি। এরূপ মুক্ত পুরুষের দ্বারা জগতে কোন অন্যায় হতে পারে না। বরং তারা অনাসক্তভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে জগতের উপর উপকার কর্ম্ম করে যেতে পারে। কর্ম্মের কোন দাগ, ফলাফলে তাঁদের জড়াতে পারে না। তারা যে নির্ব্বিকার-নির্ম্মল-পবিত্রাত্মা স্বরূপ! রাজর্ষি জনক—বিদেহ জনক ছিলেন এইরূপ একজন জীবন্মুক্ত কর্ম্মী-মহাপুরুষ। তাঁর দেহের সঙ্গে, রাজ্য সম্পদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই মাত্র ছিল না। আবার তিনি যথাযথ ভাবে উহার সদ্ব্যবহার, সদ্‌চালনাও করে গেছেন। জনৈক মুনি একদিন তাঁর নির্লিপ্ততার পরীক্ষা কর্ত্তে এসে বল্লে—"মহারাজ, আপনার জনক-নগরী আগুন লেগে পুড়ে গেল।" তিনি উত্তর কল্লেন—"তাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি আছে হে! সমস্ত রাজ্য কি এ দেহটা পর্য্যন্ত ধ্বংস হলেই বা আমার কি ধ্বংস হবে?

আমার ধ্বংস'ও নাই, বৃদ্ধি ও নাই, অপর ও আমার কিছুই নাই, নিজের ও আমার কিছুই নাই। আমি ত আর সামান্য দেহ সর্ব্বস্ব নই? আমি যে সকল, সকলই যে আমার। অমি যে, স্বয়ং, সেই পরমাত্মাই। দেহে অবস্থান কল্লে'ও দেহের সহিত তাঁর কোন সম্বন্ধই ছিল না, বলেই তিনি বিদেহ নামে—বিদেহ-জনক নামে পরিচিত।

পদ্মপত্রের যেমন জলেই জন্ম, জলেই স্থিতি, আর জলেই লয় হলেও উহাতে জলের দাগ লাগে না, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষের এই সংসারেই জন্ম, সংসারেই স্থিতি, আবার সংসারেই দেহ লয় হলেও সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ, সংসারের কোন দাগই তার লাগে না।

কোন কোন নব্য শিক্ষিতের মুখে শুনতে পাই—শ্রীকৃষ্ণ অত গোপিনী নিয়ে কি নিষ্কলঙ্ক ছিলেন? "হারে অবোধবা' তিনি যে একশত অষ্টগোপী, ষোল শত রমনী নিয়ে ক্রীড়া কর্ত্তেন তোরা দুই এক জন নারীর মন যোগাতে পারিস্‌নে। আর উনি নারীর মন যোগায়ে ও অত যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাম্রাজ্য শাসন প্রভৃতি কার্য্য অক্লেশে করে গেলেন। একি সামান্য শক্তির কাজ তিনি হলেন পূর্ণ-চৈতন্য শক্তি, আর গোপীরা তাঁর শুদ্ধা-মুক্তি দায়িনী—প্রেমরূপিনী শক্তির বিলাস। তাদের আবার ময়লা? তারা সবই যে নিষ্কাম-নিঃসঙ্গ-চিরমুক্ত। ব্যাসপুত্র শুকদেব বহুবৎসর মাতৃ জঠরে থেকে, পূর্ণ যৌবনে মুক্তাবস্থা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মেই সদ্ভাবে বিভোর

হয়ে দিব্যদৃষ্টিতে উন্মাদবৎ যে দিকে পা যায় সেইদিকেই বেগে ছুটে চল্লেন। সদ্যজাত মায়ামুক্ত পুত্র গৃহত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন দেখে, মায়াবদ্ধ বৃদ্ধ ব্যাসদেব তাকে সংসারে ফিরায়ে আনবার জন্য তিনি তার পিছু পিছু ছুটলেন। উভয়ে এইরূপে চলতে চলতে যমুনা তীরে এসে পড়্লেন। গোপীগণ বস্ত্র, তীরে রেখে নগ্ন দেহে তখন জলকেলি ক'রছিলেন। শুকদেব তাদের সম্মুখ দিয়ে উলঙ্গাবস্থায় চলে গেলেন, কিন্তু যখনই ব্যাসদেব সেখানে আসছেন দেখ্লেন, তখনই তারা স্ব-সব্যস্তে লজ্জানত মুখে স্ব-স্ব-বস্ত্র পরিধান কল্লেন। এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখে ব্যাসদেব হঠাৎ থেমে গিয়ে তাদের লজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা কল্লেন। তারা উত্তর দিলেন—"আপনার উলঙ্গ পুত্র যৌবন-সম্পন্ন হলেও তার যে তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মেছে, সে যে আত্ম-জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ, তার দেহ সম্পর্কীয় জ্ঞানই নাই, তাই তার শরীরে কাম দেখি নাই, আর তজ্জন্য আমাদেরও লজ্জা আসে নাই। আর আপনি শতবর্ষের বৃদ্ধ ঋষি হলেও আপনাতে আসক্তি আছে, কাম আছে, তাই আমাদের লজ্জার কারণ হয়েছে। শুকদেব যে নির্ব্বিকার, তারে দেখে বিকার আসবে কেমন করে? তাই একজন মুক্ত পুরুষের দর্শন হলেও কোটি কোটি জন্মের বন্ধন আলগা হয়ে যায়। যার সর্ব্বরূপে আত্ম-দর্শন হয়েছে—সেই তত্ত্বজ্ঞানী। তারই মাত্র তখন কামনায় নিবৃত্তি হয়েছে, ভোগের সমাপ্তি হয়েছে। তখন কেবল-উপভোগ-প্রেম-সমাধি।

মায়া ও মুক্তি।

রোজ রোজই প্রাণী সকল মরছে, অথচ যারা বেঁচে আছে তারা ভাবছে—আমরা অমর, যমের দক্ষিণ দোর বেন্ধে রেখে এসেছি, এই যে ভুল, এই ভুলই মায়া। সকলের হতে স্বীয় পুত্র কন্যা, পতি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতি রক্তমাংসীয় সম্পর্কীয়দের প্রতি যে অত্যধিক মমতা-টান, অথচ সকলেই সেই এক আত্মা, ইহার জ্ঞানের অভাবই মায়া। অজ্ঞানই মায়া, জ্ঞানই মুক্তি। অজ্ঞান ঘোর অমাবস্যা, জ্ঞান পূর্ণিমার ফুল্ল জ্যোৎস্না। জ্ঞান মুক্তির পথে, ভগবানের পথে টেনে নেয়, আর অজ্ঞান বন্ধনের দিকে কষ্টের দিকে টেনে রাখে। এই টানাটানি নিয়েই ত এই জীব সংসার চক্র চল্‌ছে।

ভগবানকে দয়াময় বলি, কিন্তু তিনি জীবের প্রতি সহজে সদয় হন না। মা যেমন নানা খেলনা দিয়ে শিশুকে ভুলায়ে রেখে নিজে আড়ালে থেকে নিজের নিজের কাজ করে যান। কাজ শেষ হলে, অথবা কোন বেপরোয়া দুরন্ত ছেলে খেল্‌না টেল্‌নায় না ভুলে মা ব'লে কেন্দে, ছুটে যায়, তখনই মাত্র মা তাকে কোলে নিয়ে থাকেন। তদ্রূপ ভগবান ও জীবকে সংসারের মধ্যে নানা রং তামাসার খেলায় মত্ত করে রেখেছেন। যে অভুলো জ্ঞানী ছেলের তাঁর প্রতি প্রবল টান এসেছে; তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে, কেঁদে পাগল হয়ে ছুটে পড়েছে, —সেইই মাত্র তাকে পেয়েছে, তাঁকেই তিনি কোলে নিয়েছেন।

সোজা কথায় বলে না ?—'জোর যার মুল্লুক তার'। জোর করে যে চাইতে পারে সেই পেয়ে থাকে। খাবার সময় যে সন্তানটি বেশী আব্দার ও জোর জবরদস্তি করে, মা সমদৃষ্টি হলেও তাঁকেই সকলের আগে বেশী ও ভাল খাবারটা দিতে বাধ্য হয়ে পড়েন। ভগবানও আমাদের পুত্র কন্যা স্বামী স্ত্রী রূপ নানা রকমের মায়ার বন্ধন দিয়ে বদ্ধ ক'রে বশ করে রেখেছেন। যে মুক্তি না পেলে বুঝবে না ব'লে জেদ করে দাঁড়াতে পারবে সেই কেবল মুক্তি পাবে। এ দুনিয়াটাই চালাকি বজ্জাতির দ্বারা চলছে, আর সে বেটা বাদ পড়বে কেন ? সেও সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, কিন্তু যে তাকে পাবো বলেই জেদ করে বসে, সেইই তাকে পেয়ে থাকে, সেইই তাঁর ভাব সম্যকরূপে অবগত হয়ে থাকে। যে জোর করে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারে—"আমি মুক্ত, আমি আত্মা, আমি চৈতন্য" সে তখনি মুক্ত হয়ে যাবে। "আমি সব। আমার মধ্যে তাঁর পূর্ণ বিকাশ। আমি সবারই মধ্যে রয়েছি, এক বিন্দু ধূলিকণাও তাহাতে বাদ নাই"। এইরূপ যে তেজের সহিত বলে, চিন্তা করে, ধারণা করে, কার্য্য করে সেই স্বভাব হয়ে যায় ; তারই মায়া কেটে যায়, মুক্তি নেমে আসে।

মনই সব করে, জলই যেমন কাদার সৃষ্টি করে, আবার জলই উহাকে ধৌত করে দেয় ; তদ্রূপ মনই সব বন্ধন এনে দেয়, আবার মনই সব বন্ধন কেটে দিয়ে মুক্ত করে দেয়। এক মনেরই গতি কভু উর্দ্ধে কভু নিম্নে।

ঘৃণা-লজ্জা-ভয় এই ত্রিতাপ, মায়ার ত্রিবেড়ী। এই বেড়ীর একটি দ্বার মুক্ত কত্তে পাল্লেই, সব দ্বারই খোলা হয়ে যাবে। সব মূর্ত্তিই যে আমি, কার লজ্জা কর্বো? সবরূপই যে আমার কোন্‌টারই বা নিন্দা কর্বো, কোন অঙ্গেরই বা ঘৃণা কর্বো? অনন্ত মূর্ত্তিতে যে আমিই বিরাজমান! আমাকেই আমি ভয় কর্বো? এইখানেই ত মজা! এইই মায়া—এইই মুক্তি। এইরূপে সর্ব্বদা আত্মোপলব্ধি কত্তে কত্তেই ত্রিতাপ জ্বালা ভবের বন্ধন কেটে যায়, মুক্তি লাভ হয়।

কোন কিছুতে টান্ বা আসক্তি না থাকাই জীবন্মুক্তি স্বর্ণ শৃঙ্খলই হোক, আর লৌহ শৃঙ্খলই হোক, বন্ধন কল্লে যেমন সহজে মুক্ত হওয়া যায় না; তদ্রূপ সৎই হোক, আর অসৎই হোক, পাপ, পুণ্য, ভালমন্দ যে কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র টান বা আসক্তি থাক্‌লেও মুক্ত হওয়া যায় না। বন্ধন বড় ভয়ানক। সবই ত্যাগ কর্ত্তে হবে। তবে প্রথম পুণ্য ধরে পাপকে শুভ ধরে অশুভকে ত্যাগ করে করে শেষে শুভকেও ত্যাগ কত্তে হবে। শুভাশুভ,পাপপুণ্য কিছুই চাই না। অযাচ্ঞা-অকামনা,অনাময়ওম্।

দেহত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত মায়া একেবারে ত্যাগ হয় না। সময় সময় উদয় হয়, কিন্তু ভগ্নদন্ত সর্পের মত মুক্ত পুরুষের আর কোন ক্ষতি কত্তে পারে না। শরীরের সহিতই মায়ার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মায়াকে আশ্রয় করেই তাঁর সব লীলা খেলা কিনা? মায়া না থাকিলে এ জগৎ থাকত না। কোন অনুভূতিই হোত না। জগতের অস্তিত্বই এই মায়া।

আবার তাতে রহস্য কি জান ? সেই মহামায়ার কৃপায়ই জীব তার হাত হতে অব্যাহতি পায়। তার কৃপা না হলে, তোমায় ছেড়ে না দিলে তুমি যেতে পারো না। মহামায়ারই এ জগৎ ! এ জগৎই মায়াময়, তোমার ছয়টিই ইন্দ্রিয় আছে, তুমি উহার দ্বারা জগৎকে একরূপ দেখছ, যার উহা হতে কম বা বেশী আছে সে তদ্দারা কম বা বেশীরূপে জগৎ রহস্য অবগত হচ্ছে। ইহা বুদ্ধিমানের নিকট একরূপ, মূর্খের নিকট আর একরূপ, ধনীর নিকট একরূপ, আবার দরিদ্রের নিকট আর একরূপ দেখাচ্ছে। যার ইন্দ্রিয়গণ ও শক্তি যেরূপ, সে সেইরূপই বস্তুতঃ এ জগৎটাকে দেখছে। কেবল যে মুক্ত, সমাধিযুক্ত সেইই এ জগৎ রহস্যকে মায়াকে জানতে পেরেছে। তাই জগৎ বলে তার কোন অস্তি-নাস্তির বোধই হচ্ছে না। সে স্বয়ং স্বভাবময় রয়েছে। আগে এই মায়ার—প্রকৃতির উপাসনা কর। উহার মধ্য দিয়াই, উহার হাত দিয়াই উহার হাত হতে মুক্ত হতে হবে। কত মহাপুরুষ, কত মুনিঋষি পর্য্যন্ত এই মায়াকে, এই বিশ্ব প্রকৃতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ডুবে গেল। সর্ব্বদা চক্ষু মুঁদে এই মহামায়াকে দর্শন কর্ব্বে, এই প্রকৃতির ধ্যান কর্ব্বে, চিন্তা কর্ব্বে, আর মুক্তির জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা কর্ব্বে—"হে মায়ারূপিণী দেবী, আমায় মুক্ত কর মা, আমায় মুক্ত কর"। তবে তার কৃপা হলে বন্ধন খুলে যাবে। এর এত শক্তি যে, জীবকে একেবারে অধঃপাতে নিয়ে যেতে পারে, আবার নিমেষ মধ্যে পরিবর্ত্তন করে উচ্চে,—মক্ষধামে

পর্য্যন্তও নিয়ে দিতে পারে। তোমার সাধন ভজন কর্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে, শাস্ত্রালোচনা, সাধুসঙ্গ কর্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে, মঙ্ক পেতে ইচ্ছা হচ্ছে, এ ও মায়ার প্রেরণা। আবার চুরি করে, অন্যায় করে সুখী হতে ইচ্ছা হচ্ছে এও সেই মায়ারই প্রেরণা, তারই শক্তি। বলো—"মায়া—মায়া—মা—মা", সব দূর হয়ে যাবে। ওঁ মা!

গুণত্রয় ও জীবের অবস্থা ভেদ।

সত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণ। ঐ গুণ ভেদে জীবের অবস্থা ও তিন প্রকারের। যখন তমঃপূর্ণ থাকে, তখন তার কুৎসিত কার্য্য, কুৎসিত ভাবই বেশী ভাল লাগে। সে সর্ব্বদা বদ্ধ হয়ে থাকতে, দাস হয়ে থাকতেই অধিক ভালবাসে। তারপর রজঃগুণ যখন প্রবল হয়, তখন সে কিছুতেই আর বদ্ধ থাকতে চায় না, কারও নিকট মস্তক অবনত কর্ত্তে পারে না, ঘৃণা লজ্জা বোধ করে; সে তার সম্মুখে কোন অন্যায় কর্ম্ম দেখতে পারে না, তখনই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয়, সেই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব কর্ত্তে, দুনিয়া সম্ভোগ কর্ত্তে চায়। রাজার ভাব তার ভিতর আসে বলেই তাকে রাজসিক ভাব বলে। রাজার গুণ রজোগুণ।

অতঃপর সত্বগুণ। সত্বগুণে—সাত্বিকভাবে একেবারে শান্ত—স্থির—পবিত্র! তার মুখে বেশী বাক্য স্ফুরে না, চোকের চাহনি স্থির হয়ে যায়। তারে দেখ্‌লে হিমালয়ের ন্যায় গম্ভীর, সমুদ্রের ন্যায় অতল, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্কর এবং চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ বলে মনে হয়। সে একে একে সমস্ত জগতের সঙ্গে বিলীন হতে চলেছে। তার আমিত্ব স্বার্থত্ব দাসত্ব তখন

কোথায় চলে যায়! সর্ব্বত্র এক ভূমা দর্শন করে। আর, তাঁর পূজা করা, সেবা করা, তাঁতে প্রেম করা ভিন্ন তার অন্য কোন কর্ম্ম করারই শক্তি থাকেনা। সাম্য তখন তা'তে ওতঃপ্রোত ভাবে বিরাজ করে। এইরূপে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শীকেই বেদে ব্রাহ্মণ বা সত্ত্বগুণী বলেছে। "ব্রহ্ম জানাতি যঃ স ব্রাহ্মণ।" ব্রহ্মকে যে জেনেছে, সেই-ই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ অভেদ, এইখানেই গুণের শেষ। এর পর যা, তা গুণাতীত—নির্গুণ পরব্রহ্মাবস্থা।

কিন্তু জেনো, এই ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ ঔরশে জন্মে না। ব্রাহ্মণ অবস্থায়—জনন-পালন-মারণ ক্রিয়া চলে না। রজো-তমোগুণের সময়ই জনন পালন-মারণ ক্রিয়া সম্ভবে। ব্রাহ্মণ নিষ্ক্রিয়াবস্থা। ব্রাহ্মণ পুত্র এ কথাই স্ববিরোধী। ব্রাহ্মণ কি এত সস্তারে! কোটির মধ্যে ও দু'চারটি মিলে কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মণেরই প্রতি শব্দ দেবতা। আর এর বিরুদ্ধ ভাব যা, তা আসুরতাম ভাব। অসুরের তমঃগুণ প্রধান: এরা সকল রকম অন্যায় ঘৃণিত কর্ম্ম করতেই চির অভ্যস্ত। এরা দানব। সত্ত্বগুণী দেবতা।

শাস্ত্রে দেবাসুরের কথা, দেবাসুরের যুদ্ধের কথা বর্ণনা আছে। সর্ব্বকালই এ যুদ্ধ চ'লে আসছে। দুষ্টগণ সকলেরই অপকারের জন্য সদা ব্যস্ত। আর শিষ্টগণ, সকলেরই মঙ্গলের জন্য সদা সর্ব্বকাল প্রস্তুত। উহাতে তারা মৃত্যু বরণ করে নিত্ত খুসী। দস্যুরা যেমন সর্ব্বদা দস্যুবৃত্তি কচ্ছেই, আর রাজকর্ম্মচারীরাও

সর্ব্বদা তাদের শাসন কর্ত্তে চেষ্টা কচ্ছেই, শিষ্টদের বাঁচায়ে রাখতে চেষ্টা কচ্ছেই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পক্ষই ত হটে নাই!. যুদ্ধ চল্‌ছেই, এ অনন্তকাল চলবেই। রজোতমোর দ্বন্দ্ব থেমে গেলে যে সবই থেমে যায়! সৃষ্টি লীলা লয় পেয়ে যায়।

এই যুদ্ধ যেমন সর্ব্বদা বহির্জ্জগতে চল্‌ছে, অন্তর্জ্জগতে ও তেমন চল্‌ছে। প্রতি দেহেই কতকগুলি সত্বগুণ সম্পন্ন দেব-শক্তি, কুণ্ডলিনী চৈতন্যশক্তিকে জাগাতে চাচ্ছে, মুক্ত কর্ত্তে চেষ্টা পাচ্ছে, যেখান হতে এসেছে পুনঃ সেখানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা কচ্ছে; আর কতকগুলি তমঃগুণ সম্পন্ন আসুরিক শক্তি আবার সেইরূপ উহাকে দাবায়ে রাখতে, বদ্ধ করে রাখতে চেষ্টা করছে। এ ও ঐ দেবাসুরের-সুরাসুরেরই যুদ্ধ। এ জীবনটাই একটা যুদ্ধ স্বরূপ। এ যুদ্ধ মিটে গেলেই শান্তি—মুক্তি। কিন্তু দেহ ত্যাগেই এ যুদ্ধের শেষ হয়না, এরা আবার অন্য দেহে আশ্রয় করে লেগে যায়। কুণ্ডলিনীর জাগরণ, সত্যের জয় না হওয়া পর্য্যন্ত মিটে না। তবে সত্যের জয় চিরকালই। সত্যমেব জয়তে।. দু'দিন আগে, আর পরে, আর কি?

দেবতা কথায় ভয় পেয়ো না। মানুষই দেবতা। অন্য কেউ নয়। ভাস্করের চার হাত, পাচমাথা বিশিষ্ট মেটে প্রতিমা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেওনা। ও সব হোল ঐ ঐ শক্তিসমূহের কাল্পনিক রূপকাটি মাত্র।. মানুষই দেবতা—ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব, রাম-কৃষ্ণ-চৈতন্য। মানুষের মধ্যেই তাঁর লীলাখেলা। মানুষ-

রূপেই ভগবান্। যত্র জীব, তত্র শিব। যাহা জীব, তাহাই শিব। ওম্ শিবো—ওম্ শিবো!

ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্ম উপলব্ধির বস্তু। উঁহাকে বিচার যুক্তি কি শাস্ত্র পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া কি পাওয়া যায় না। কেবল যখন উঁহার শক্তির বিকাশ হয়, তখন বুঝ্‌তে পারা যায় উঁহা তাঁর কার্য্য, তাঁর শক্তি। শক্তি ও প্রকৃতি একই। ঐ শক্তি বা প্রকৃতির লীলাই ব্রহ্মের সক্রিয়াবস্থা, আর ব্রহ্মের ঐ সক্রিয়াবস্থাই ব্রহ্মাণ্ড।

পরব্রহ্ম ত্রিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁর লীলা প্রকাশ কচ্ছেন।—জড়শক্তি, জড়শ্চেতন শক্তি আর শুদ্ধ চেতন শক্তি। ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম, তথা কাঠ, পাট, মৃত্তিকা, মৃত-দেহ প্রভৃতি জড়শক্তি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ক্রিমি প্রভৃতি জীবন্ত-গুলো জড়শ্চেতন শক্তির অন্তর্ভুক্ত। এবং জড় ও জড়শ্চেতন হীন সূক্ষ্ম দেহী সমুহ চৈতন্য শক্তির অন্তর্ভুক্ত। এই তিন শক্তির অতীত নিত্যমুক্ত—নিত্যচৈতন্যস্বরূপ যে পরমাত্মা তাহাই পরব্রহ্ম।

পরব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজ কচ্ছেন। যেমন সব পাথরেই অগ্নি আছে, সব জায়গাই শূন্য আছে, ঘা মারলেই অগ্নি জ্বলে উঠে, শূন্য প্রকাশ হয়ে পড়ে, তদ্রূপ সব দেহেই সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম আছে, কিন্তু জ্ঞান-ভক্তিরূপ মুষলদ্বারা জোরে ঘা না মাল্লে প্রকাশ হন না। ভগবান্ জীবের প্রতি সহজে সুলভ নয় গো! জ্ঞানোদয় হলে জান্‌বে—তিনি সাকার—নিরাকার—সর্ব্বাকারই।

ব্রহ্ম আর ব্রহ্মাণ্ড যেন সাগর আর তার ঢেউ। সাগর যখন স্থির থাকে, তখন আর ঢেউয়ের অস্তিত্ব থাকে না। আর যখন অস্থির হয়ে উঠে তখনই বিভিন্ন ভাবের বিচিত্র চিত্রের ঢেউ সকলের সৃষ্টি দেখা যায়। ব্রহ্ম ও ঠিক সেইরূপই, যখন নিষ্ক্রিয়, তখন—অনন্ত অদ্বয়-অব্যক্ত-শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র—নির্ব্বিকার পূর্ণানন্দ স্বরূপে উপলব্ধি হয়। আর যখন সক্রিয়াবস্থায় দেখা যায়—তখন সৃষ্টি স্থিতি লয় যুক্ত, সুখ-দুঃখ-ভাল-মন্দ দ্বন্দ্ব যুক্ত সদাপরিবর্ত্তন—বৈচিত্রপূর্ণ রহস্যযুক্ত বলে মনে হয়। বড়ই তামাসা! এ বড়ই রহস্য! ব্রহ্ম যখন একই, তখন এগুলোও ব্রহ্মেরই স্বরূপ-ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের অণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড। অজ্ঞানান্ধকারেই উহার রূপ দৃষ্ট হয় না, বোধে আসে না। এ যে ঐ অতল বারিধিরই নাচ, তরঙ্গ, তোলপাড়! এই উঠ্‌ছে, এই পড়ছে, এই হচ্ছে, এই মিশ্‌ছে, এই—এভাবে আব সেভাবে আর কি। কিন্তু বস্তু একই হ'তে নাহি ভুল। এ রাজ্যে এলে আর কিছুই নাই—ব্রহ্ম-ময়ম্ তখন।

পণ্ডিতেরা আবার এ জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে দুই ভাগে ভাগ করে বিচার কচ্ছেন। এক মনোজগৎ বা আন্তর্জ্জগৎ আর বহির্জ্জগৎ বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। প্রতি দেহই এক একটা ব্রহ্মাণ্ড, এক একটা জগৎ। এই তোমার দেহজগতে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়গণ নিয়ে সূক্ষ্মরূপে যে সূক্ষ্মভাবের লীলা চল্‌ছে—এ সূক্ষ্ম বা আন্তর্জ্জগত। আর কত রকমের ক্রিমি-কীটগণ, রোমাবলী, নাড়ী-শিরা-মস্তিক প্রভৃতি স্থূল রূপের জিনিষ নিয়ে যে স্থূল-লীলা চল্‌ছে,—এ

স্থূল বা বহির্জ্জগৎ। ক্রীমিকীটগণের সমষ্টিই ত তোমার দেহের কারণ। তোমাদের দেহই তাদের বিরাট ব্রহ্মাণ্ড। আবার আর এক প্রকারের বিরাট বিশ্ব-জগৎ বা বহির্জ্জগৎ ও আন্তর্জ্জগৎ আছে—এই পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রগণ ও মহাকাশ নিয়ে।

স্থূল শরীরে আবদ্ধ স্থূলবুদ্ধি বিশিষ্ট মানবের পক্ষে সূক্ষ্ম জগতের ধারনা আনা অসম্ভব, বড়ই কঠিন। এই অস্থি-মজ্জা মেদময় যে স্থূল শরীর, যখন ইহা ত্যাগ হয়, তখন ও সূক্ষ্ম শরীর থাকে। মুক্তি না এলে সূক্ষ্ম শরীরের নাশ হয় না। এই সূক্ষ্ম শরীরের নাশই মুক্তি। যদি ইহা না হোত, তবে ত মৃত্যু হলেই মুক্তি হোত! আর কোন চেঁচামিচি, ভাব্য-ভাবনার দরকারই ছিল না। কিন্তু স্থূল শরীরকে মৃত্যু, আর সূক্ষ্ম শরীরের ত্যাগকে মুক্ত বলে। এই যেমন স্থূল শরীরে স্থূল বিশ্ব-জগতের কত স্থূল বিষয় দেখ্‌ছ, যার সূক্ষ্ম শরীরের সূক্ষ্ম জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেছে, সে ও সেইরূপ কত সূক্ষ্মজগতের কত সূক্ষ্ম বিষয় দেখ্‌ছে। এই তোমরা আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ছ, পিছন হতে যদি কেউ তোমাদের ডাকে, সে ডাক কর্ণে এসে পৌঁছাবে, স্নায়ু উহা মনের নিকট নিয়ে এসে দাঁড়ায়ে থাকবে কিন্তু মন এখান থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত উহা শুনতে পাবে না। যখন কেউ ভাবস্থ হয়ে রয় বা মনোপ্রাণ নিয়ে কোন বিষয়ে ডুবে থাকে, তখন তার সমস্ত স্থূল ইন্দ্রিয় খোলা থাক্‌ল বটে, কিন্তু কোন কিছু দেখ্‌তে শুনতে বা অনুভব কর্‌তে পারে না। সময় সময় এমন হয় যে, স্নায়ু পর্য্যন্ত ও এসে পৌঁছায় না। এই মন হোল

সূক্ষ্ম, এ হতেও সূক্ষ্ম আত্মা—পরমাত্মা রয়েছেন। আর এই সব জায়গায়, এই আকাশ স্থানে তোমরা মনে কত্তে পারো, কিন্তু ওর মধ্যেও অসংখ্য সূক্ষ্ম জীবদেহী রয়েছে। প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে কত জীব বাইরে বেরুচ্চে ভিতরে প্রবেশ কচ্চে তা কে নির্ণয় কত্তে পারে? সূক্ষ্ম জীব বায়ু হতে আকাশ হতেও হাল্‌কা, কিন্তু শক্তি বিশিষ্ট। আবার দেখ্‌ছুনা, কত স্ত্রী কি পুরুষকে পরী-পেত্নীতে পেয়ে থাকে। কত আজগুবী ক্রিয়া করে, বহু দূরের খবর এনে দেয়, মনের কথা বলে দেয়, রোগের ঔষধির ব্যবস্থা করে দেয় ইত্যাদি। এ সব কি? কেউ কি চোকে দেখেছ? শুনেছ মাত্র। যখন ঐ সূক্ষ্মদেহীরা কোন স্থূলদেহ বিশিষ্ট প্রাণীর ওপর চেপে বসে, কার্য্য করায়, তখন তার শক্তি দেখে কতকটা বুঝো, বা মনে একটা ভেবে নাও। তা বলে ওদের বড় বলে মনে করে বসো না। ওদের অনেকের শক্তিই মানবের চেয়ে কম। যাদের শক্তি মানবের কাছাকাছি, তারাই মানবের কাছে এসে থাকে; দুর্ব্বল বা প্রবল শক্তিরা আসে না। মানুষের মধ্যে যারা দুর্ব্বল, অশুচি, লোভী কামী তাদের ঘাড়েই লোভ দেখায়ে এসে চেপে বসে; কত কিছু করায়। এই সূক্ষ্ম দেহীরা পূর্ব্ব স্থূল দেহে আবদ্ধ ছিল, পরে কোন কারণে স্থূল দেহ হতে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে মহাবিপদে পড়ে যায়। মুক্তও হতে পারে না, পুনঃ স্থূল দেহ নিয়ে জন্মাতেও পারে না। তাই ঐরূপ দোদলবান্দা হয়ে এখানে, সেখানে, ঐ শরীরে ও শরীরে ঘুরে বেড়ায়। এইরূপে কেও বা কোন মহাপুরুষ দর্শনে তাঁর কৃপায়

মুক্ত হয়ে যায়, কেও বা কারো দ্বারায় তীর্থক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ, মস্‌জিদে নামাজ কি গির্জ্জায় তার জন্য উপাসনা করায়ে পুনঃ স্থূল দেহ গ্রহণের উপায় করে নেয়। যত সব "বারটার" দেখা, ও সবই ওদের কার্য্য ওরা মুক্ত বা পুনঃ শরীর গ্রহণের উপায় করার জন্য এ সব কার্য্য কচ্ছে। কিন্তু এ ভিন্নও অনন্ত জগতে কত অনন্ত-রূপ স্থূল-সূক্ষ্ম দেহী যে রয়েছে, তা কে নির্ণয় কর্ব্বে ?

বিশ্বরূপ বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন।

ব্রহ্ম ত সব জায়গায়ই রয়েছেন। যার জ্ঞান নেত্রের ঠুসি খুলেছে সেই দেখতে পাচ্ছে। চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহ-তারা, জল-বায়ু অগ্নি ব্যোম সবই সেই ব্রহ্মশক্তির বিকাশ, মহামায়ার লীলা ভঙ্গি। যখন তোমার দেহ জগতে অসংখ্য জীব বাস কচ্ছে, যেমন চোকপোকা, কানপোকা, চেঁইপোকা, কৃমি প্রভৃতি যা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তোমরা আবার এই পৃথিবীদেহে বাস কচ্ছ। পৃথিবী আবার বিশ্বজগতের দেহে বাস কচ্চে। সে বিশ্বজগৎ আবার কোন মহা বিশ্বজগতের মধ্যে আছে, তা কে বলবে ? ফাঁকা, শূন্য স্থানেও অসংখ্য জীবের বাস যখন, তাতেই প্রমাণ হয় যে,—ব্রহ্মময়ম্ এ ব্রহ্মাণ্ড। যেখানে যেখানে মায়ার বাতাস বইছে, সেখানে সেখানেই ব্রহ্মসমুদ্রের ঢেউ নেচে উঠ্‌ছে। আর তা দেখে সব ভাবছে—ঐ বুঝি সব। কারণ তখন আকারে দেখা যাচ্ছে। অশান্ত মনে—শান্ত সমুদ্রের অস্তিত্বই বোধ হচ্ছে না। এই যা কিছু দেখ্‌তে পাও না পাও, শুন্‌তে বা ধারণা কত্তে পারো, না পার,—সবই সেই বিরাট ব্রহ্মেরই রূপ। এইরূপ ভেবে ভেবে, ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে, তন্ময়

হয়ে গেলেই বিশ্বরূপ বা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তজ্ঞানী অর্জ্জুনের একবার এইরূপ দর্শন হয়েছিল, এ কি আর বলবার বোঝাবার জিনিষ? কঠোর কর্ম্ম, কঠোর তপস্যা কত্তে হয়, তাঁর কৃপা লাভ কত্তে হয়, তবে তাঁর কৃপায় মায়া চলে যায়—সব প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ওগো, তুমিই যে তাহাই! সেই পরব্রহ্মই! তত্ত্বমসী! তৎ-ত্বম্ অসি! তোমার পুত্রের মধ্যে, কন্যার মধ্যে, পতির মধ্যে পত্নীর মধ্যে পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে, আত্মীয় অনাত্মীয় সমস্ত মানব মণ্ডলীর মধ্যে, পশুপক্ষী জীবজন্তু সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, উহা ব্যাপিয়া, উহা সাজিয়া যিনি বিরাজ কচ্ছেন, তিনিও যা, তুমিও তাই। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ মহাব্যোমের মধ্যে যিনি, তিনিও যা, তুমিও তা, আমিও তাহাই! সমস্তই এক এক সত্ব। এই ভাবা, উপলব্ধি করাই তত্ত্বমাসী। এ অবস্থায় পৌঁছিলে তাকে কেউ বলে মুক্ত হয়েছে, কেউ বলে ভগবদ্দর্শন হয়েছে, আত্মদর্শন হয়েছে ইত্যাদি।

এ অবস্থায় পৌছিবার পূর্ব্বে সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত বস্তুতে শত্রুতা ভাব ত্যাগ হয়ে বন্ধুত্ব ভাব এসে যায়। এইরূপে যখন শত্রুতা নাশ হয় সারা জগৎ বন্ধুতে ভরে উঠে আর এই বন্ধুতে এমন গাঢ় হয় যে, দ্বৈত বোধ একেবারে চলে যায়—অদ্বৈত ভুমিতে একেত্রে মিলে যায় মিশে যায় তখন শত্রু ও থাকে না মিত্র ও থাকে না, জন্ম-মৃত্যু, কর্ম্মাকর্ম্ম ও থাকে না। কেবল স্বাভাবিক অব্যক্ত নিত্য পূর্ণানন্দে—আনন্দ স্বরূপে বিরাজ করে।

ইহাই মহাসমাধি—মহানির্ব্বাণ! ইহাই সমস্ত জীবের একমাত্র কাম্য—প্রাপ্য, শেষগতি। কিন্তু এ বড় অদ্ভুত রহস্য যে, আপন অজ্ঞান রূপ মায়ার আবরণে আপনি আপনাকে গুটি পোকার মতন বদ্ধ করে, আবার আপন স্বরূপ দেখ্‌বার জন্য বেরুতে চেষ্টা কচ্ছে! এই নিত্যশান্তির জন্য সকলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ চুরি কচ্ছে, কেউ ইন্দ্রিয় সম্ভোগ কচ্ছে কেউ উপবাসী হয়ে কঠোর তপঃজপ সাধন ভজন কচ্ছে, ধর্ম্ম কচ্চে, বেদ-বেদান্ত তীর্থ তীর্থে খুঁজ্‌ছে! কিন্তু এত পাওয়ার নয়, এ যে নিত্য পাওয়া! ঐ নিত্যানন্দ, নিত্যস্বরূপই যে আমি! এক অদ্বৈতই যে আমি! আমিই সেই! আমিই সেই! সোহম্‌ সোহম্‌ ওম্‌॥ (ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি।)

ত্যাগ ও সেবা।

"সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ"

সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগকেই বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ত্যাগ বলে থাকেন। পুত্র কলত্র, আত্মীয় কুটুম্ব, বিষয়-আশয়, সব ছেড়ে দিয়ে একমাত্র সেই পরমাত্মা ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই ত্যাগ। মনের মধ্যে কোন প্রকার কামনা-বাসনা না থাকাই ত্যাগ। সন্ন্যাসী শুকদেব, আর গৃহস্থ রাজা জনক, এরা দু'জনেই ছিল দুটি ত্যাগের আদর্শ। আসল কথা, যে যেরূপেই থাক্, অনাসক্ত থাকাটাই প্রকৃত ত্যাগ। ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানুষঃ, ত্যাগই মানুষকে অমৃতত্ব লাভ করায়ে দেয়। আসক্তিই বন্ধন মৃত্যু, ত্যাগই মুক্তি-অমৃতত্ব।

ত্যাগ ও ত্যাগের অধিকারী।

যার কিছু আছে, সেইই কিছু ত্যাগ কত্তে পাবে। যার কিছু নাই, সেকি ত্যাগ কর্ব্বে? বুদ্ধের রাজত্ব ছিল, পত্নীপুত্র ছিল, শত শত দাস দাসী ছিল, বহুত ধন-সম্পত্তি-ঐশ্বর্য্য ছিল, তাই তিনি উহা ত্যাগ করেছিলেন। লালাবাবুর অত বড় জমীদারী ছিল তাই তিনি উহা ত্যাগ করায় সুন্দর মানাইয়ে ছিল। এঁদের জিনিষ ছিল, শক্তি ছিল, ভোগ ও হয়ে গিছ্‌ল, তাই ও সব ত্যাগ করে আর গ্রহণ না করে পেরে ছিলেন। জগতে এরূপ ত্যাগের একটা মহান আদর্শ দিয়ে গেছেন। আর

এই তোমাদের মধ্যে কয়েকজনে ত্যাগী সাজবার জন্য আমাকে বিরক্ত করে তুলেছ। তোমাদের কি আছে যে, তা ত্যাগ কর্ব্বে? রোজ খাট, রোজ খাও, ঘরে ছেলেপিলে মা-বাপ আছে, তাদের খাবার-পরবার দিতে হয়। ভাঙ্গা ঘর দিয়ে জল পড়ে। পরণে লেংটি, তার আবার ত্যাগ কর্ব্বে কিহে? আগে রোজগার কর, সম্পত্তি কর, ভোগ কর, শেষে ভোগে যখন বিরক্তি আসবে, তখন আপনি সব ত্যাগ হয়ে যাবে! তা না, এদিকে কর্ম্মের ভয়ে, ধর্ম্মের নামে বৈরাগী সাজলে, আর ওদিকে ছেলেপিলে পরিবারের সমস্ত না খেয়ে ম'লো। ভারী ধর্ম্ম কল্লে ত! এরে ত্যাগ বলে না, এ ভণ্ডামী। আজকাল এইরূপ কতকগুলো ভণ্ড আল্‌সে কর্ম্মের ভয়ে পেটের দায়ে বৈরাগী সেজে এ দেশটাকে পবিত্র-ধর্ম্মটাকে জাহান্নামে দিচ্চে, জগতের নিকট হেয়ত্বের প্রমাণ করে দিচ্চে। তাই বল্‌ছি—আগে দুনিয়া ভোগ-দখল কর, শেষে ভোগে বিতৃষ্ণা এলে ত্যাগ করিও। ভোগের শেষেই মাত্র ত্যাগ। আর বাইরে ত্যাগ দেখালে কি হবে? ও ত ত্যাগের জন্য ত্যাগ নয়, ও যে নাম-যশঃ ভোগের জন্যই ত্যাগ, ভণ্ডামী, কৃত্রিমত্ব, অন্তরে অন্তরে ত্যাগের নামই প্রকৃত ত্যাগ। ঐ রুদ্রানন্দ, শুকদেব, এরা ত্যাগ নিয়ে সন্ন্যাস নিয়েই জন্মেছে। এদের কথা স্বতন্ত্র! এরূপ যুগে যুগে জগতে দু'একটি মাত্র এসে থাকে। এরা সাধারণের আদর্শ নয়, কারণ এদের আদর্শ কে, কয় জনে ধর্ত্তে পারে? এরা শুধু মানব শরীরে কতখানি ত্যাগ সম্ভব হয়, তাই দেখাতে যায়। রাজর্ষি জনক ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, হরিঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন এই সব মহাপুরুষ জগতের প্রকৃত ত্যাগের সেবার আদর্শ। এঁদের মত হয়ে চল্লেই ধর ঠিক্ চলা হবে। এরাই প্রকৃত ত্যাগী। এদের ত্যাগ-ভোগই প্রকৃত ত্যাগ-ভোগ।

আজকাল এক দল ভেকধারী বৈষ্ণবের অত্যাচারে দেশটা অস্থির হয়ে উঠেছে। মহাপ্রভুর এমন পবিত্র প্রেমধর্ম্ম, তাহা একেবারে বিকৃত করে ফেলেছে। তাই আজকাল বৈষ্ণবের নাম শুন্‌লে-ও লোকে নাসা কুঞ্চন করে উঠে। তাদের ভোগে প্রবল আসক্তি, কিন্তু ভয়ানক আল্‌সে, কর্ম্ম কত্তে একেবারেই নারাজ! তাই করে কি, ধর্ম্মের নামে এক একজনে দুই তিন জন বৈষ্টবী নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরে আর জয়রাধেকেষ্ট বলে ভিক্ষা করে। ওদের একদম ভাসিয়ে দেবে। ভিক্ষা দেবে বুভুক্ষুকে, দীন-দরিদ্র, আর্ত্ত আতুরকে আর যে মহাত্মা পরের জন্য দেশেদেশে ঐরূপ দীনদরিদ্রের সেবার জন্য ভিক্ষা করে, তাদের দেবে। কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে নিজের উদরপুর্ত্তির জন্য এক কণাও দেবে না। ওতে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়ারূপ মহাপাপে পতিত হতে হয়। সাধু যে, সন্ন্যাসী যে, তার নিজের জন্য ভিক্ষা ক'রতে হয় না, কত জনের স্বেচ্ছা দেওয়া দানের দ্বারা সে কত কত দরিদ্রনারায়ণের সেবা করে, জায়গায় বসে।

যথার্থ ত্যাগীর কর্ম্ম।

যার ঠিক্ ঠিক্ ত্যাগ ভাব এসেছে, সে নিজের জন্য কোন কর্ম্ম কর্ত্তে পারে না। করবার শক্তিই তার লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু তখন তাঁর কর্ম্মের গতি ফিরে যায়—মোড়

ফিরে যায়। আর তখনি ঠিক্ ঠিক কর্ম্মের আরম্ভ হয়। এই কর্ম্মকেই সেবা বলে। ইহাই প্রকৃত কর্ম্ম। আর তখন তার এই কর্ম্ম সহস্র গুণে বেড়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন আদর্শ কর্ম্মী, আদর্শ ত্যাগী, আদর্শ সন্ন্যাসী আদর্শসেবক। তাই তাঁর দ্বারা অত সব কাজ হয়ে গেল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে এমন আদর্শ-ত্যাগ-শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, যে, তা চিরকাল সর্ব্বজীবের সর্ব্বপ্রকারের উপযোগী। তিনি শত শত রমণীর মধ্যে থেকেও নিষ্কাম, রাজরাজেশ্বর হয়েও নিস্পৃহ এবং মহাবলী হয়ে ও মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে সারথী মাত্র। কিছুই ছেড়ে যেতে হবে না। অনাসক্ত হয়ে সবই আয়ত্বে রেখে তার সদ্ব্যবহার কত্তে হবে। সব তা পেতে হবে। কিন্তু তাতে যেন পেয়ে না বসে। সব তাকে অধীনে রাখ্তে হবে, তার অধীন হতে বাধ্য হত্তে হবে না।

যে প্রকৃত ত্যাগী, সে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়ই নির্ব্বিকার শান্ত শিব স্বরূপ। যার অন্তরে প্রথম প্রথম ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাব আস্ছে, তার কিছুকাল সাধুসঙ্গ করা ভাল। নতুবা পিছ্লে পড়বার ভয় আছে। একবার পেকে ঠিক হয়ে গেলে, পরমহংসদেবের সোণার ঘটী হয়ে গেলে, আর মাজাঘষার দরকার হয় না। যেথা ইচ্ছা, সেথা যাও, ভয় নাই।

সর্ব্বপ্রকার আসক্তিই দুঃখ, সর্ব্বপ্রকার ত্যাগই শান্তি।

আসক্তিই দুঃখ, ত্যাগই শান্তি।

প্রায়ই সবে ভাবে ধনসম্পত্তি হলে সুখী হওয়া যায়। বহু সুন্দরী রমণী যার সেই-ই

বুঝি সুখী। কিন্তু যখন সে ধনী হয়, আর কিছুকাল উহা ভোগ করে, শেষে যদি তারে জিজ্ঞেস কর—কেমন আছ? শুনবে—যখন টাকা পয়সা এত ছিল না, তখন বড় ভাল ছিলাম। এখন চোর-ডাকাতের ভয়ে রাত্রে নিদ্রা হয় না, মামলা-মোকদ্দমায় ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে, চারিদিকে শত্রু দাঁড়ায়েছে, সোয়াস্তি নাই। আর পারি না। ভগবান্ এখন আমায় নাও, মুক্ত কর। বহু স্ত্রী ওয়ালাকেও জিজ্ঞেস কর্ব্বে, সেও ঐরূপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেবে। জগতের রীতিই ঐরূপ। যেটা পাওয়া গেছে, সেটায় বিতৃষ্ণা, যেটা পাওয়া যায় নাই, সেইটারই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যখন জগতের সব পাওয়া, পাওয়া হয়ে যাবে, জগতের নিত্যধন নিত্য পাওয়া ভগবান্‌কে পাওয়া হবে, মাত্র তখনি সেই দিনই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, ভোগের সমাপ্তি নিত্যশান্তি।

যারা আমাকে পেয়েছে, এমন কি যে যে যতক্ষণ এখানে রয়েছে, ততক্ষণ কোন ভাবনা নাই, কোন কামনা নাই, কোন উদ্বেগ ও নাই,—একেবারে তন্ময়—বিভোলা সব। এইরূপ সঙ্গ কর্ত্তে কর্ত্তে যাদের গতি বদ্‌লে গেছে, ত্যাগের নির্ব্বাণের দিকে চলে গেছে, তাদের আর কোন ভাবনা নাই। তারা পূর্ণশান্তির খোঁজ পেয়েছে, আর ভুলে পড়্‌বে না। কিন্তু যাদের এখনও সে ভাব স্থায়ী হয়ে বর্ত্তে নাই, তাদের পুনঃ পুনঃ আস্‌তে হবে, এই সব সাধুদের সঙ্গ কর্ত্তে হবে। আমিও কোন তন্ত্র মন্ত্র সাধন ভজন জানি নাহে! আমি এই সাধুদের সঙ্গে পড়ে থাকি, এই সাধু সঙ্গে থাকাই আমার নিত্য স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

এতেই আমার নিত্যআনন্দ এখানে পুনঃ পুনঃ এসো, বসো সাধুর বাতাস গায়ে লাগায়ো ; এখানে দর্শনে, স্পর্শনে আলাপনে মুক্তি-মহাপ্রেমলাভ।

যখন যে ভাবে থাকো, তাতেই সন্তুষ্ট থেকো। আত্মতৃপ্তিই সর্ব্ব সাধনার সিদ্ধি, নিষ্কামভাব, আপ্‌নাতে আপ্‌নি থেকো মন যেযো নাক কারো কাছে। তাঁর ইচ্ছার'পর ভার দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যাও।

জগতে যে যত পূর্ণভাবে ত্যাগ কত্তে পারে, তার নিকট তাহাই তত ঠিক্ ঠিকভাবে বাধ্য হয়ে তার পূজো কত্তে ফিবে আসে। তাই বলি—যদি পেতে চাও, তবে আগে দিয়ে দাও, সব দিয়ে দাও। ওগো, দিলেই পাওয়া যায়, পার করলে পার আছেই।

ভাব না জেনে ভঙ্গী ধরা ভাল নয়।

সাধুর ভাব না জেনে ভঙ্গী ধরা ভাল নয়, তাতে মহৎ নিন্দা করা হয়। অনেক দুর্ব্বল কুঁড়েরা ভাবে—সাধুদের সকলেই আদর সম্মান করে, সেবা শুশ্রূষা করে, আর আমাকে কেউ পোছেও না, দূর করে তাড়ায়ে দেয়। কি করি—আমি সাধু হবো, অর্থাৎ সাধুর "পোষাক" নেবো, এই ত আমারই মত কত দুষ্ট হঠাৎ একটা রঙ্গিন কাপড় পরে, গায়ে আল্‌খেল্লা নিয়ে তিলক মালা ধরে সাধু বনে গেল। এইরূপ ভেবে সেও গেরুয়া প্রভৃতি নিয়ে সাধু সেজে বেরিয়ে পড়ে আর যত অকাযের একশেষ করে ছাড়ে। কত ভাল লোককে সেংফাঁকি দিয়ে সর্ব্বনাশ করে। কিন্তু এ ভণ্ডামী

আর কয়দিন চলে ? দিন কয়েক পরেই ধরা পড়ে যায়, আর লাথি চড় খায়। আর এই ভণ্ডদের ব্যবহারে প্রকৃত সাধুগণের প্রতিও সাধারণের অবিশ্বাস জন্মে যায়। এতে তার এই যে সাধুনিন্দা পাপ আসে তা খণ্ডন হওয়া বড়ই কঠিন। আবার কেহ কেহ বলে যে, হরিনামের কাচ ও ভাল সাধুর ভান ধরাও ভাল। ঐ ভাবে ক্রমে ক্রমে সাধু হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ ভাবে সাধু হতে বড় দেখা যায় না। আত্ম-প্রবঞ্চণা হতে কেহ সৎ হতে পারে না, ও শুধু যুক্তি তর্কমাত্র। ধর্ম্ম হোল প্রাণের জিনিষ, প্রাণে প্রাণে অনুভবের বস্তু ! প্রাণ থেকে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উহা জেগে ওঠে। তর্ক যুক্তির মধ্যে ধর্ম্ম নাই। ভাব না জেনে ভঙ্গী ধরা ভাল নয়, ওতে মহৎ নিন্দা করা হয়।

ত্যাগ ওসেবা একই বস্তুর এদিক ওদিক মাত্র।

ত্যাগ আর সেবা তফাৎ নয়। উহা একই বস্তু। একই বস্তুর এদিক, ওদিক মাত্র। যে যত বড় ত্যাগী, সে তত বড় সেবক জান্‌বে। যে ত্যাগ ব্রত নিয়েছে, সেবাব্রত ও তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। যে সেবা কচ্ছে, ত্যাগ সে করে নিয়েছে আগে। নিজে কিছু ত্যাগ কল্লেই, অপরকে কিছু দেওয়া যায়। অপরের অভাব বোধ না থাক্‌লেই অন্যের অভাব মোচন করা যায়। অপরের অভাব মোচন করার নামই সেবা। আবার অন্যের অভাব মোচন, কত্তে কত্তেই নিজের অভাব-স্বভাব হয়ে যায়, নিজের অভাব অভাব বোধই থাকে, অভাব যেয়ে ভাব এসে থাকে। ইহাই

যথার্থ ত্যাগ, ইহাই যথার্থ সেবা। ইহাতেই প্রেম, ইহাতেই শান্তি, ইহাতেই মোক্ষ নিরবাণ।

যারা সেবা ছেড়ে শুষ্ক ত্যাগী সাজে, তাদের প্রকৃত ত্যাগী বলে জানিবে না, জানবে ও ভণ্ডামী কুড়েমী। একমাত্র যেই আত্মায়ই তৃপ্ত, আত্মায়ই সন্তুষ্ট, আত্মায়ই যার রতি জন্মেছে, প্রেম জন্মেছে, যে আত্ম-স্বরূপ হয়ে সমাধি ঘরে গিয়ে বসেছে, সেই-ই মাত্র কর্ম্ম বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে, অপরে নহে। নিজের জন্যই হোক, পরের জন্যই হোক, কর্ম্ম কর্ত্তেই হবে। কর্ম্ম শূন্য হয়ে জীব বেশীদিন শরীর ধারণ করে থাকতে পারে না।

সেবার স্বরূপ।

গরীব দুঃখী দোরে এসে দাঁড়ালে, সাধ্য মত এক মুষ্টি চাল একটি পয়সা বা একখানি বস্ত্র দিয়ে দিবে। কখনো ফিরিয়ে দিও না। আর পারত, বড় বড় বিশ্বাসী সৎপ্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু বা এককালীন মোটা দান কর্ব্বে। এতে পুণ্য আছে। এ ভাল। কিন্তু সেবা এরও উপরে, অনেক উপরে। অন্যে না চাইলেও তার অভাব খুঁজে গিয়ে পূরণ করে দেওয়া, স্বয়ং তার পরিচর্য্যা শুশ্রূষা করা। প্রাণের থেকে করা। কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, আনন্দ হয় বলে করা—অকারণ করা। একেই বলে সেবা। এতে পুণ্যের ও উপরে প্রেম লাভ হয়। নিজের যখন সাধ্যে কুলায় না, তখন অন্যের দ্বারে গিয়ে, অন্যকে সাথী করে, ভিক্ষা করে করে ও আর্ত্ত-আতুর, দীন দরিদ্রের সেবা কর্ব্বে। সেবার মতন আর জগতে কোন বড় কাব নাই।

দানের মধ্যে ধর্ম্ম-দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। কারণ ধর্ম্মই মানুষকে সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বাতীত সেই নিত্য নিত্যানন্দ ধামে চির-কালের জন্য নিয়ে যায়। এ দানে চিরকালের মত তার সব অভাব দূর হয়ে যায়। এর পরে জ্ঞান দান। জ্ঞানে মানুষকে সুখ দুঃখ ভাল মন্দ বোধ জন্মায়ে ধর্ম্মরাজ্যে পৌছায়ে দেয়। তৃতীয় প্রাণ দান এবং চতুর্থ শেষ দান, অন্নবস্ত্র দান। কিন্তু কোন দানই নিকৃষ্ট নহে। দান কথাই কি উচ্চ কি মহান ভাবোদ্দীপক। এই সব নিম্নস্তরের দান কর্ত্তে কর্ত্তেই উচ্চস্তরের দানে প্রবৃত্তি ও শক্তি আসে। এই দান, ত্যাগ, সেবাকে এক কথায়, জীবের সর্ব্বপ্রকার অভাব-অপূর্ণতা মোচন করে পুনঃ চৈতন্য করান বলে। এই সেবা ধর্ম্মেই মহাদেব শিব, মহামানব বুদ্ধ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে, ভিক্ষু সেজে ছিলো। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, সমস্ত জাগতিক সুখে জলাঞ্জলী দিয়ে বেরুলে বলেছিলেন ঈশ্বর-ফিশ্বর, ভগবান্ টগবান বলে আর আমায় বিরক্ত কর কেন? আমি একা ভগবান হওয়ায় তোদের, লাভ কি ? সকলেই ভগবান। তুই ভগবান, আমি ভগবান ও ভগবান, দুনিয়ার যা কিছু সবই ভগবান। সব ব্রহ্মময়। ভগবান্ ভগবান্ বলে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ ? শুনছ না ঐ আমার সেই বিবেকানন্দের আনন্দের বাণী—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" সর্ব্বরূপে তাঁর সেবা কর। সব আমি, সব আমি, অনন্তরূপে আমি। অনন্তরূপে আমার সেবা

কর। তুমি ও আমি, আমি ও তুমি। সেবা, সেবা, প্রেম-প্রেম-অনন্ত প্রেম, ওম্ (সমাধি)।

সেবায় চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হলে চিৎ-স্বরূপ ভগবানকে পাওয়া যায়। পরস্পরের প্রতি সাহায্য সেবা করাই যে মানব ধর্ম্ম। যে একটি মাত্র প্রাণীকে ভালবাসতে শিখেছে, সে জগতের সব্বাইকে ভালবাসতে পেরেছে। চিত্তশুদ্ধ, পবিত্র না হলে প্রকৃত ভালবাসা বর্ত্তে না। এই তুমি যাকে ভালবেসে ফেলেছ, সে কোন গুরুতর অন্যায় কল্লেও তুমি তাতে ক্রোধ প্রকাশ কত্তে পার্ব্বে না। কারণ তুমি তোমার প্রাণের বস্তুতে আঘাত দিয়ে বাঁচতে পারো না। সে ভিন্ন তোমার যে আর প্রিয়বস্তু, কাম্যবস্তু নাই। সেই-ই যে তোমার একমাত্র যথাশক্তি সে যে তোমার প্রিয়তম। তা হতে তুমি নিজকে ছোট বা বড় বলে গর্ব্বিত বা ঈর্ষিত হতে পারো না। তাতেই তুমি মুগ্ধ। অন্য কিছুতেই যে তোমার আর মোহ আনতে পারে না। সমস্তই যখন তুমি তাতে সমর্পণ করেছ, তখন ষড়রিপুর ও তুমি আর বাধ্য নও। তোমার প্রিয়তম যাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার মনে ব্যথা লাগে, এমন কোন কাজই তুমি কত্তে পারো না, কারণ তখন উভয়ে এমন রূপে একত্বের দিকে পৌছেছ যে "পীরিত ভাঙ্গার ভয়ে কেহই কোন অন্যায়ই কত্তে পারো না, বরং যাতে প্রীতির চরমোৎকর্ষ হয়, পূর্ণ মিলন হয়, সমাধি আসে সেই সব কর্ম্মই স্বাভাবিক ভাবে কর্ত্তে আনন্দ পাও। যাহাই

সেবায় চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হলে ভগবানকে পাওয়া যায়।

কর। এরূপ পরস্পরের সেবায় এমন পবিত্রতা চিত্তশুদ্ধ তায় আসে যে, তখন ভাল বৈ মন্দ, আনন্দ বৈ নিরানন্দের আর উদয় হয় না।. তখনই সেই পরমানন্দময় ভগবানের সাক্ষাৎ হয়। যখন একজনের সেবায় এমন পরমানন্দ আসে, তখন তাঁর অনন্ত মূর্ত্তির বন্ধুভাবে সেবায় যে কি আনন্দ আসে তা আর কি বোলব! সে কি প্রেমানন্দ. কি মহানন্দ! তখন আনন্দময়েই লীন হয়ে যাবে।

অনন্ত সমুদ্রের এক স্থানের এক বিন্দু স্পর্শ কল্লে, যেমন সব স্পর্শ হয়ে যায়, তদ্রূপ তাঁর অনন্ত রূপের অনন্ত মূর্ত্তির যে কোন এক মূর্ত্তির মধ্যেই তাঁর প্রকাশ ভাব জানতে পাল্লেই সবই জানা হয়ে যায়, পাওয়া হয়ে যায়।

এই দেখ, আমাকে এরা যারা সেবা করে ভালবাসে, আমার দর্শনে তাদের দর্শনেন্দ্রিয় আত্মার সহিত আনন্দে নৃত্য করে উঠে, দর্শনে আত্মা পুলকিত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে; আমার কথা তাদের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হয়, আমার আত্মার ঘ্রাণ যেন তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করে, তাদের রসনা যেন আমার নাম গানেই সদা বিভোর হয়ে রয়, অন্যের বোধ দূরে থাক, আমা ভিন্ন নিজের বোধ পর্য্যন্ত থাকে না। আমার সঙ্গে আমার মধ্য দিয়া সেই অনন্ত সত্বার সঙ্গে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়, আমাময় হয়ে যায়, এক হয়ে যায়। আর আমিও তখন ঐরূপ হয়ে যাই, ওদের অনন্ত রূপের মধ্যে পড়ে অনন্ত ভাবের উদয় হওয়ায় অনন্ত হয়ে অনন্তে মিশে যাই এরূপ মানবের দ্বারা কি

আর কোন অন্যায় সম্ভবে? জ্ঞাননেত্রের পর্দ্দা যে তখন হটে যায় দেখে "যত্র জীব, তত্র শিব"! প্রতিমূর্ত্তিই নারায়ণ! এ ব্রহ্মাণ্ডময়ই নারায়ণ! আপনি ও নারায়ণ হয়ে নারায়নানন্দে মিশে যায়।

প্রেমের অঙ্কুর হতেই সেবাধর্ম্মের উদ্ভব। এই সেবাধর্ম্ম সাধন কর্ত্তে কর্ত্তেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয়। আর এই প্রেমের শেষই সমাধি। এই পূর্ব্বাবস্থায় পৌঁছালে আর ঈশ্বর অনিশ্বর দ্বৈত্যাদ্বৈত বোধ থাকে না। তখন থাকে শুধু "ওঁ" ভাব। এর শেষে যা, তা বলা কথার ওপারে—অব্যক্ত।

যত যাগ-যোজ্ঞ, তপঃ জপঃ ন্যাস-কুম্ভক, সাধন-ভজন যাই কর, কর্ম্ম ভিন্ন সেবাকর্ম্ম ভিন্ন মুক্তি নাই। এই হরেক রকমে তাঁর সেবাই একমাত্র কর্ম্ম, একমাত্র সর্ব্বকালের সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম। এধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ কর, ধন্য হও! ওঁ তৎ সৎ ওঁ!

গুরু ও সাধনা।

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎ পদংদর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

গুরু কি?

অখণ্ডমণ্ডলাকার এ বিশ্বচরাচরে যিনি ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, সেই পরব্রহ্ম—বিশ্বরূপ যিনি প্রদর্শন করান, তাঁকেই নমস্কার, তিনিই গুরু। যার দর্শনে কোটি জন্মের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, স্পর্শনে প্রেম উপজে, তিনিই গুরু। গুরুরূপে সাক্ষাৎ ভগবান্। তাঁকে প্রহরে প্রহরে শ্বাসে প্রশ্বাসে অন্তরে অন্তরে সর্ব্বক্ষণ প্রণাম করি, শরণ করি।

জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবান গুরুকে জগতে পাঠায়ে দেন। গুরু শরীরে প্রকাশ হন। কিন্তু বড় আশ্চর্য্য যে, জগতে সকলেই গুরু হতে চায়, চেলা হতে কেউই চায় না। চেলা না হলে হে গুরু হওয়া যায় না। যিনি খাটি চেলা, হাজার হাজার জনের ভক্ত, হাজার হাজার লোকের মন যোগায়ে চল্‌তে পারেন, মনের মতন হতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। যার কথা আপনারা সকলে আহ্লাদে শুন্‌বে, মান্‌বে, কার্য্যে পরিণত কর্ব্বে, তিনিই গুরু। সকল হতে যিনি গুরু, তিনিই গুরু। গুরুগিরি বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। জগতের জন্য সকলের জন্য সমস্ত ত্যাগ কর্ত্তে হবে, আপনার জন্য কিছু রাখ্‌বে না, তবে গুরু। যে কিছু রাখে না, তার সবই থাকে; যার কিছু নাই,

তার সবই আছে। যার কিছু আছে, তার কিছুই নাই। একটা সংসেজে ঢংসেজে, কতগুলো চেলা বানায়ে গুরু সেজে বসো না। তাতে নিজেও অধঃপাতে যাবে, অন্যকেও অধঃপাতে নেবে। গুরু আদর্শ মানব। তার পূর্ণত্যাগ-বৈরাগ্য, জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতা সত্য ও ধৈর্য্যবীর্য্য চাই, সবদিক পূর্ণ চাই। আর এত পবিত্রতা লাভ কত্তে হবে যে, যে আস্‌বে পাপী তাপী সব পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্রতাই গুরুর স্বরূপ।

গুরু গ্রহণ কত্তে হয় কেন? উহা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

জীবমাত্রেই জন্মিবামাত্র যা সম্মুখে পায়, তাই ধরে শিখ্‌তে আরম্ভ করে, জান্‌তে আরম্ভ করে, সে চায় উহা ধরে ঐরূপ হতে, বড় হবে, উহা সম্ভোগ কত্তে। উহাই তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সে যে আদর্শ সম্মুখে পাবে, তাই আয়ত্ব কর্ব্বে। ঐ আদর্শ সৎ ও মহৎ হলে সেও সৎ ও অসৎ হবে, আর অসৎ হলে সেও অসৎ হবে। মানব জীবনের উদ্দেশ্য মুক্ত হওয়া, তার আদর্শ ও মুক্ত মানুষ। এই মুক্ত পুরুষই গুরু নামে অবিহিত। সুতরাং গুরু আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

গুরু গ্রহণ কর্ব্বার সময় বিশেষ হুসিয়ার হয়ো, বিশেষ সন্তর্পণের সহিত পরীক্ষা করে নেবে। বল্‌তে পারো—আমি আঁধারে রয়েছি আলোকের সন্ধান কেমনে জানব? তা হলে ত আমি চৈতন্যই হয়ে গেলাম আর গুরুর প্রয়োজন কি?" কিন্তু বাইরের দোষগুণ, ভালমন্দ ত বুঝ? সেই বোধ দ্বারা বিচার কর্ব্বে, আর মনে মনে বিশেষভাবে বিচার করে নেবে

যে—যাঁকে দেখা মাত্র আপনার বলে মনে হয়ে যায়, যেন কত কালের চিরকালের চেনা, পরিচিত, পরমাত্মীয়। যাঁর প্রতিকথা মনের অন্তঃস্থলে গিয়ে ঠিক্ বলে পৌঁছে, সব সন্দেহ, ধাঁধাঁ দূর হয়ে যায়। যিনি সৌম-শান্ত, পূর্ণ সুগঠন, পূর্ণ প্রেমমূর্ত্তি! স্বেচ্ছায় যাঁর শ্রীচরণে মস্তক নুইয়ে পড়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয় যাঁর পদে বিকিয়ে যায়, তাকেই গুরু বলে আপনার গুরু বলে জানবে গ্রহণ কর্ব্বে। শত বাধা বিঘ্ন পড়্লে ও ঠেক্‌বে না।

গুরু কখনো ত্যাগ কত্তে নাই। গুরুত্যাগ মহাপাপ। গুরু চিরকাল-সর্ব্বজ্ঞাতা, সর্ব্ব কর্ম্ম কর্ত্তা। এই জন্যই গুরু পরীক্ষা করে নিতে হয়। তুমি যে বিষয় না জানো, না বোঝ এবং সাধারণে ও না বুঝে নিন্দাবাদ করে, এমন কাজও যদি কখনো গুরুকে কত্তে দেখ, তাতেও তুমি তাঁতে অবিশ্বাসী হতে পার্ব্বে না, বরং আরো গূঢ় রহস্য জান্‌বার জন্য ভক্তি প্রদর্শন কর। গুরু সৎ ভিন্ন কখনো অসৎ হতে পারে না। ধর্ম্ম জগতে এমন সব গুহ্য তত্ত্ব রয়েছে যে, তা বেদ বেদান্তের অজ্ঞাত; তাই প্রকৃত ভক্তের ভাব "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়, তথাপি পরম দয়াল নিত্যানন্দ রায়।"

ঘরের কোনে' বৌ যদি স্বামীতে মন উঠে না বলে একবার নিজ স্বামী ত্যাগ করে বাজারে বেরুতে পারে, তবে কি আর তার উপপতি (স্বামীর) অভাব হয়? কত শত শত নাঙ্গ তার পিছনে পিছনে পয়সা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দিন কয়েক একটু সুখ সম্ভোগ করে। কিন্তু ক্রমেই বয়স বাড়্‌তে থাকে, শরীর

দুর্ব্বল হতে থাকে, আর ক্ষোভ, পরিতাপ, জ্বালা আসতে থাকে। অবশেষে ভগন্দর, গনোরিয়া, গম্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভুগে ভুগে পচে পচে নরকের দ্বার ভর্ত্তি করে। তদ্রূপ যে একবার নিজ গুরু শক্তিসঞ্চারণকারী লোক গুরুকে ত্যাগ কত্তে পারে, তার আর কখনো গুরুর অভাব হয় না। অশান্তিরও আর অভাব হয় না। সে শুধু চেঁকেই যায়, খাওয়া আর তার জীবনে হয় না। কোন কিছু একটা আঁকড়ে ধরে জীবনটা কাটায়ে দাও। ক'দিন বা আর বাঁচা? কত জন্মই কত ভাবে গেল! এ জন্ম ও না হয় ভুল হোক্। সত্য হোক, ঐ একজনের পদেই, ঐ একজনের ভাবেই ডুবে যা'ক।

যার পদে মাথা নুইয়েছ, নুইয়েই যাও। মানুষ বলে মরগো, যদি মরে বাঁচ্তে পারো! মরেছিল একদিন হনুমান, তাই সে অমর। তার রামচন্দ্র মূর্ত্তিতে এত বড় নিষ্টা ছিল যে, সে সেই মূর্ত্তি বৈ আর জান্তো না একদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কাঙ্গাল বিদায় কচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্রই যে এবার মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ হয়ে কাঙ্গাল বিদায় কচ্ছেন ইহা জেনে, হনুমান ও বিভীষণ দুই বন্ধু একত্রে ভগবানের কাঙ্গাল বিদায় দেখ্তে একদিন, মথুরায় উপস্থিত। যে আস্ছে, সেইই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম কচ্ছে, বিদায় হচ্ছে, কিন্তু দুই বন্ধু সেই নবদুর্ব্বাদল-পদ্মপলাশলোচন শ্রীরাম-চন্দ্র মূর্ত্তি না দেখ্তে পেয়ে কেমন থমকে গেল। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ ভাব জেনে বল্লেন—"আমিই সেই ত্রেতাযুগে, রামরূপে তোমাদের সনে লীলা করেছিলেম।" "তোমরা এস, প্রণাম কর।"

সন্দেহ কচ্ছ কেন? তারাও ধ্যান করে জান্‌তে পেলে যে-ইঁনিই সেই রামচন্দ্র। কিন্তু তবু বল্লে—

"হে প্রভু! শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রাম কমললোচন॥

যদিও শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ, এক পরমাত্মা, তথাপি কমললোচন রামই আমাদের সর্বস্ব। তাকে বৈ আর জানি না, আর বুঝি না। যে চরণে একবার এই মস্তক বিকিয়ে দিচি, কেমন করে সেই এক চরণে দেওয়া মস্তক, অন্য চরণে আর বার দেব? হে প্রভু! যদি তাহাই হও, তবে সেই ধনুর্ধারী মূর্ত্তি না ধল্লে প্রণাম কর্বো না। তুমি আর বার তোমার সেই শ্রীমূর্ত্তি ধরে আমাদের মনোসাধ পূর্ণ কর!" তখন আর ভক্ত বৎসল হরি কি করেন? ভক্তের নিকট শ্রীসীতারাম মূর্ত্তি ধর্ত্তে বাধ্য হলেন। এরাই আদর্শ ভক্ত। আদর্শ গুরুভক্তি দেখাবার জন্যই ভক্ত অবতাররূপে এসেছিলেন।

তারক গোস্বামী বল্‌তো—

"যে যাহারে ভক্তি করে, সে তার ঈশ্বর,
ভক্তিযোগে সেই তার স্বয়ং অবতার।"

এ যুগে, তাহাই। যে যাহারে ভক্তি করে, ভগবান বোধে ভক্তি করে, সেইই তার নিকট স্বয়ং অবতার, পূর্ণ ভগবান। তার অনন্ত মূর্ত্তি! যে যা ধরে প্রকাশ হ'তে পারে।

গুরু ও ভক্তের কর্ত্তব্য।

গুরু শিষ্যের দৈহিক মানসিক সর্ব্বপ্রকারের অভাব অসুবিধা দূর করে, তাকে প্রকৃত শান্তির পথে নিয়ে যান। যে প্রকারেই হোক, তাকে প্রকৃত পথে নিতেই হবে। প্রেম-ভালবাসাই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ। প্রেমের জয় চিরকালই। যদি একজন ভক্তও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তাতে ভক্তেরও যেমন অপরাধ, গুরুরও তা হতে কম নয়। উভয়েরই সমান অপরাধ। শিষ্য ত বুনো পাখী! তার আবার কি? সে রাধাকৃষ্ণ না বল্লে যে উপদেষ্টাই দায়ী।

গুরু মাতাপিতার যুগল প্রতিমূর্ত্তি। তিনি শিষ্যের প্রকৃতি ভাব, অবস্থা বুঝে—পুত্র কন্যা, ভ্রাতাভগ্নী বা বন্ধু বান্ধবের ন্যায় ব্যবহার কর্ব্বেন, বন্ধুত্ব ভাবই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। শিষ্য যে অন্যায় কর্ম্ম ক'রে সুখ পাচ্ছে, গুরু যদি ন্যায় ও সৎকর্ম্ম দ্বারা তাকে তদপেক্ষা অধিক সুখ শান্তি দিতে পারেন, দিয়ে তাকে উন্নত কর্ত্তে পারেন, তবেই তার কর্ত্তব্য শেষ হবে। তিনি ভক্তের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে প্রস্তুত। ভক্তসুখে সুখী। ভক্ত ও তন্ত্র-মন্ত্র, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শাস্ত্রাশাস্ত্র, এমন কি সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে গুরুরূপ মহাসমুদ্রে ডুবে যাবে, তাঁতে ভগবৎ জ্ঞানে লীন হয়ে যাবে। যে কূলে থাকে, সেইই জলের দোষগুণ দেখতে পারে; কিন্তু যে মৎস্য হয়ে তাতে ডুবে যায়, সে আর কিছু দেখতে পারে না। তদ্রূপ পবিত্রতার প্রতীক গুরুতে তন্ময় হয়ে গেলে আর গুরুর গুণাগুণ বিচার থাকে না। গুরুময় হয়ে, গুরু হয়ে যায়।

গুরুর আদেশ পালন করা, তাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখাই ভক্তের কর্ত্তব্য। এতে তিনি যেথায় নিয়ে যান, সেথাই বৃন্দাবন মোক্ষধাম। গুরুকে তাঁর প্রকাশ বলে মেনো, সম্মান করো। একটু জ্ঞান হলেই দেখবে—গুরুও যা, তুমিও তা, পরব্রহ্ম ভগবান্‌ও তা। সব এক, কোনও প্রভেদ নাই, অভেদ।

গুরুর সহিত মিশ্‌তে পাল্লেই ভক্তের জীবন সার্থক। আবার একজন ভক্তের সঙ্গে ও গুরু মিশ্‌তে পাল্লে তাঁর জীবন ও সার্থক। জল-বায়ু অগ্নির যে কোন একটুর যে কোন অংশের এক পার্শ্ব স্পর্শ কল্লে, জান্‌লে যেমন উহার সমস্তই স্পর্শ ও জানা হয়ে যায়, তদ্রূপ সেই এক ব্রহ্মেরই অনন্ত মূর্ত্তির যে কোন এক মূর্ত্তির স্বরূপে আপন স্বরূপ জেনে মিশে যাওয়া। এক হয়ে যাওয়াই সমস্তের সঙ্গে, পূর্ণের সঙ্গে মিশে যাওয়া। বস্তুতঃ গুরু শিষ্যকে পবিত্র করে, আপনার সঙ্গে এক করে নেন, আর ভক্ত ও নিজের মধ্যেই গুরুর পবিত্র মূর্ত্তি, পবিত্রভাব প্রবিষ্ট করে এক হয়ে সেই অনন্ত একের সঙ্গে মিশে যায়। ইহাই গুরু ভক্তের কর্ত্তব্য।

সাধনা ও সাধনায় গুরুর প্রয়োজন।

সৎ কর্ম্ম করাই সাধনা। গুরুর আদেশ পালনই সাধনা। এতেই সাধ পূর্ণ হয়। সাধ-না, সাধ্‌, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা না থাকা, নিবৃত্তিই সাধনা। সর্ব্ব বিষয় হতে মনের সাধ্‌ বা প্রবৃত্তি চলে গিয়ে আত্মায় আত্মস্থ হবে, এইই সাধনা, এইই সকল ধর্ম্মের, সকল জীবের উদ্দেশ্য। পুনঃ স্বভাবে ফিরে যেতেই সকলের আকাঙ্ক্ষা।

উহাতেই সকলের শান্তি, উহাই সকলের স্বভাব, স্বভাব প্রাপ্তিই সাধনার সিদ্ধি।

গুরুর সাধ্ নাই, কাম নাই, নিত্য সমাধিযুক্ত। তাই তার নিকটই সাধ্ কাম হীন-নির্ব্বাণ রাজ্যে যাবার কৌশল জান্তে হবে, তার সঙ্গে চলে যেতে হবে। যে, যে রাজ্যে পৌঁছেছে, সেই সে রাজ্যের প্রকৃত পথের সন্ধান জেনেছে। কেবল তার নিকট হতেই সে পথের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যাবে।

মন্দিরে যাবে, এগোতে থাকো। প্রথম প্রথমই পাণ্ডা খুঁজো না। কত ষণ্ডাগুণ্ডা পথে ঘুরছে—পথিকের পকেট কাট্‌তে। কার হাতে পড়ে যাবে। মূলধন খোঁয়াবে! শেষে আর আসল পাণ্ডাকে ও বিশ্বাস কর্ত্তে পার্ব্বে না, মন্দিরেও যাওয়া হবে না। এগোতে থাক, এগোতে থাক, এগোতে এগোতে যখন মন্দিরের দরজায় ঠেক্‌বে, তখনই আসল পাণ্ডা টেনে তুল্‌বে। তাই সময় হলে গুরু আপনি এসে জুট্‌বেন, আর তাকে দেখেই চিনতে পার্ব্বে। তাঁকে খুঁজে নিতে হবে না। আপন আপন বুদ্ধি মত্তানুসারে যতদূর পার চল্‌তে থাকো। চিন্তা কি? স্বাবলম্বীর উদ্দেশ্য কখনো ব্যর্থ হয় না। স্বাধীনতাই যে ভগবানের স্বরূপ।

সাধনার অধিকারী কে? সাধনার প্রকার।

যাকে তাকে বীজ দিতে নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ ছড়াতে হয়। যে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী, অনুগত, বলবান যার হৃদয়ে স্বাধীনতার হাওয়া লেগেছে, বন্ধে যার প্রাণ ধড়্‌ফড়্ করে উঠেছে, সেইই সাধনার অধিকারী।

যার বিষয়ে বিরক্তি এসেছে, যে উদাসীন, অথচ কর্ম্মবীর, গুরু তাকেই আত্মজ্ঞান প্রদান করেন। মহাভাব তারই প্রাপ্য।

সাধন, ভজন, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, যে যাইই বলুক, যাই, করুক, সকলেরই উদ্দেশ্য তাঁর নিকট পৌঁছান। এ সবগুলোই তাঁর নিকট পৌঁছাবার পথ মাত্র। আরো কত পথ আছে। তাঁর রাজ্যে পৌঁছাবার এক পথ, আবার এক একজনের এক এক পথ। রাজধানীতে পৌঁছাতে হলে যেমন যার যার গ্রামের পথ দিয়ে চলে শেষে এক রাজপথেই সকলকে উঠতে হয়। তদ্রূপ প্রথম এমত, সেমত, এধর্ম্ম সেধর্ম্ম শেষে যখন এগিয়ে গিয়ে প্রশস্ত উদার একপথে উঠবে, তখন দেখবে বিভিন্ন মোটেই না। সকলেই একপথে একই উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

জ্ঞানীরা জ্ঞানের সাধন কচ্ছে। তারা জ্ঞান দ্বারা দেখছে ব্রহ্মময়ম্ এ ব্রহ্মাণ্ড। সেই এক সত্তা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ওতপ্রোত-ভাবে রয়েছেন। তাকে ডাকার প্রয়োজন কি? পৃথক করার প্রয়োজন কি? তিনিই যে আমি, আমিই যে তিনি—তত্ত্বমসি! ওম্! এইরূপ ভাবনা করে তারা তাঁতে মিশছে।

কর্ম্মীরা কর্ম্মের সাধন কচ্ছে। তারা প্রতিমূর্ত্তিতে তাঁর সত্ত্বা জেনে তাঁর সেবা কচ্ছে। এইরূপে সেবা করে করে তাঁর সর্ব্বরূপে আপন অস্তিত্ব বিলিয়ে দিয়ে সেই অনন্ত সত্ত্বায়ই মিশে যাচ্ছে।

যোগীরা যোগস্থ হয়ে আছে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে তাতে সমাহিত হয়ে আছে। ধ্যানস্থ হয়ে আছে। তাঁকে ভাবতে

ভাব্‌তে, তাঁর চিন্তা, তাঁর ধ্যান কত্তে কত্তেই তাঁতে সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছে। তখন তুমি আমি প্রভৃতি দ্বৈত জ্ঞান্ দূরে গেছে। সহস্রারে তাঁর পূর্ণ জ্যোতিঃতে তন্ময় হয়ে মিশে যাচ্ছে।

আবার ভক্তেরা আপন আপন উপাস্যের মধ্যে তাঁর পূর্ণ প্রকাশ জেনে, তাঁর পূজা, ধ্যান, তাঁর সেবা করে করেই তাঁর সহিত আপন সত্ত্বা মিশিয়ে দিয়ে সেই একই পরমানন্দে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু যে যে পথ, যে ভাব নিয়েই চলুক, সেই একত্বের দিকেই চল্‌ছে। তাঁর অনন্ত মূর্ত্তি, অনন্ত নাম, অনন্ত ভাব। যে যে নামে, যে মূর্ত্তিতে যে মিশে সেই অনন্ত মহানে আপন আপন একত্বে মিশ্‌তে পারে মিশুক, বাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন কি? ভিন্ন ত কেউ নয়! অপর ত কিছু নয়, সবই যে এক। সব মতই যে তোমার, সব ভাবই যে তোমার। তুমি কোনটা নিন্দা আর কোন্‌টা বন্দনা কর্ব্বে? পাগ্‌লামী কেন হে? আমি পাগল নই! তোমরাই যে সব পাগল। যখন আমার মত পাগল হবে, বুঝ্‌বে কে পাগল! হরিবল্ হরিবল্!

যে, যে পথ ধরেছ, ধরে থাক। অন্যের পথে বাধা দিওনা।

যে যে পথ ধরেছ, ঠিক ধরে থাক। পথ ভ্রষ্ট হলে মহাবিপদ। পথে অনেক ছদ্ম-বেশী দস্যু-ডাকাত সাধু সেজে পথ ভুলিয়ে নিয়ে, শেষে সর্ব্বনাশ করে থাকে। সাবধান্! লোভে পড়ো না, ভুলে ভুলে যেয়ো না। যে পথে চলেছ, একদম চল্‌তে থাক। ক্ষান্ত হয়ো না। একদিন ঠিক স্থানে পৌঁছাবেই।

তুমি শাক্ত, তোমার ভাব অন্যের সম্পূর্ণ উল্টো। তাই অন্যে

তোমার নিন্দা কল্লেও ত্যাগ কর্বে না। বা তাদের মতের ও নিন্দা কর্বে না। তুমি যে তার পথ জান না, আবার সেও ত তোমার পথ জানে না। তা পরস্পর বোকার মত বিবাদ করে মর্বে কেন? তুমি তোমার ভাবে চলে যাও। অন্যের সমালোচনায় কান দিওনা, বা অন্যের ভাবের সমালোচনাও করো না। আর তুমি বৈষ্ণব, কি বৌদ্ধ, কি মোসলেম খৃশ্চান, তুমিও তোমার ভাবে তোমার কর্ত্তব্য করে যাও। তার নিয়মের একটু ও এদিক ওদিক যেয়ো না। যার যেটা ভাল লাগে, সে সেইটা করুক। এইটুকু মাত্র ঠিক জান্‌বে যে—যে পূজোর যে মন্ত্র, তার খাঁটি উচ্চারণ চাই। একটু ও বাদ দিলে চল্‌বে না। সিদ্ধ হবে না।

যে যেভাবে চলেছে, তাতে ও বাধা দিবে না; বরং তাকে তার ভাবে চল্‌তে আরো সাহায্য কর্বে, তবেই ধর্ম্ম হবে। পরস্পরকে তাঁর নিকট যেতে সাহায্য করাই যে মানবধর্ম্ম। প্রত্যেক মানুষেরই ধর্ম্ম বা ভাব যে স্বতন্ত্র। মনেরই সব কর্ম্ম কি না? প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মন, কারু সঙ্গে কারুই খাপ খায় না। ভাব বা মত ও তদ্রূপ পৃথক পৃথক। যদি একটু গভীর চিন্তা করে দেখো, তবেই সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী দুর হয়ে যায়। সম্প্রদায় কি? সকলে অন্ততঃ ১০।১২ জন হতে ২।৩ কোটি লোকের তাঁকে একনামে ডাকা মাত্র। কিন্তু প্রত্যেকেরই মন স্বতন্ত্র হেতু ভাব ও স্বতন্ত্র। আর যখনই মনের, ধর্ম্মের, সর্ব্বপ্রকারের বন্ধনের হাত হতে মুক্ত হবে; আত্মস্থ হবে; সমাধি বা

তাঁতে লীন হবে, তখনি দেখ্‌বে এসব কোথায় চলে যাবে। দেখবে সব এক। সেই এক শক্তিময়েরই খেলা।

অসম্ভব কিছুই নয়। দৈব ও পুরুষকার বলে সবই সম্পন্ন হয়।

যোগ, ধ্যান, ঈশ্বর আরাধনা, প্রভৃতি অনেক বড় বড় কথা শুনে অনেকে ভেবে বসে৷ যে ওঃ, ওসব কি আর আমরা কত্তে পারি? ও কি মানুষের সাধ্য? ও সব পারে মুনি ঋষিরা, সন্ন্যাসীরা। ও কি আবার অম্‌নি যেথা সেথা থেকে করা যায়? কত্তে হয় ন্যাস, কুম্ভক, যোগ আসন করে, পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে, নয়ত কোন ফল ফলে না। কিন্তু তা নয়। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামপ্রসাদ, কবীর, নানক, গোলোক, হীরামন এরা কি ন্যাস-কুম্ভক করে, পাহাড় পর্ব্বতে গিয়ে সিদ্ধ হয়ে ছিলেন? এরা কি একেবারে গৃহত্যাগী হয়ে ছিলেন? ঘরে, বনে, পাহাড়ে পর্ব্বতে সব জায়গায়ই তাঁর আরাধনা চলে। কিন্তু কথা এই—এমন সব জায়গায় তাঁর উপাসনা কত্তে হয়, যেখানে মন পবিত্র ও শান্ত থাকে, মনের প্রশান্তি বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় না হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এরূপ স্থানই সাধনার প্রশস্ত স্থান! আসল কাজ মন গুটায়ে তাঁতে বসান। শেষে মন একবার স্থির হয়ে গেলে, পবিত্র হয়ে গেলে সব জায়গায় সকল অবস্থায়ই তাকে ডাকা চলে। সর্ব্বরূপই যখন তাঁর, তখন আর ভাল মন্দ কি? তাঁতে ডুবেই, মিশেই তাঁই মগন হয়ে আছি তখন আর কি? এইটে ভাবাই সাধনা।

দৈব ও পুরুষকার বলে সব কার্য্যই সম্পন্ন হয়। এক হস্তে উপাস্য গুরু দৈব-শক্তি, আর হস্তে নিজস্ব আত্ম-শক্তির প্রকাশ

তারাই বীর সাধক সত্বর সেই অনন্ত মহানের সাক্ষাৎ লাভ করে।
সর্ব্বদা দৃঢ়ভাবে ভাববে-"আমার মধ্যে সব আছে, আমি পারি না
ত কে পার্বে? আমি সর্ব্বশক্তিমান্, সেই অনন্ত মহাশক্তির
সন্তান। তাঁর সহিত অভিন্ন।" এইভাবে যে অতি তেজের
সহিত বীরের মত সাধনা করে, সেইই তাকে শীঘ্র পেয়ে থাকে।
নতুবা ভ্যাভাচ্যাকার মত হয়ে, আমি কিছু না, আমি কিছু না,
আমি পাপীতাপী, দাস, অধম, তুমিই সব, তুমিই সব ভাবে সাধন
কল্লে কোন জন্মেও কিছু হবে না। ঐ দীন হীন, পাপীতাপী,
দাস ভাবের সাধনা কত্তে কত্তে ক্রমেই ঐরূপ হতভাগা হয়ে যাবে,
দুর্ব্বল হয়ে যাবে। দুর্ব্বলের কোন দিন ভগবান্ লাভ হয় না।
দুর্ব্বলের ভগবান নাই। আছে শুধু তার ফাঁকা নাম মাত্র।
সবলেরই ভগবান্। ভগবান অর্থেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পুরুষ প্রবর।
তিনি অনন্ত বল, অনন্ত বলের আধার। বলবান্ নির্ভীকই তাকে
পাওয়ার উপযুক্ত। তাঁর প্রকৃত ভক্ত। তারাই তাঁকে এ
যাবৎ পেয়ে আসছে। ক্ষাত্রশক্তি—ক্ষত্রিয় না হয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া
যায় নারে। তাঁকে পাওয়া যায় নারে। ক্ষাত্রশক্তির অবহেলা করেই
এই সোণার ভারত এখন কাঙ্গাল হয়েছেরে। এরা শুধু ফাঁকি
বাজী দিয়ে, রজোগুণকে তুচ্ছ করে, একলাফে সত্ত্বে যেয়ে পড়্-
বার চেষ্টায়ই গভীর গহ্বরে গিয়ে পড়েছে। আগে রাজা হও, বীর
হও, শেষে সৎ সাধু হয়ো। সর্ব্বদা কর্ম্ম কর্ব্বে, আর ধ্যান কর্ব্বে,
জপ কর্ব্বে—"আমিই সেই অনন্ত মহাশক্তি, অনন্ত সত্ত্বা, নিত্য
মুক্ত চৈতন্যব্রহ্ম।" এই ভেবে কাজে লেগে যাও, সব হয়ে যাবে।

বিশ্বাস। যতকিছু দেখো বিশ্বাসই কিন্তু সকলের মূলে। তুমি যদি বিশ্বাস কর ত জগৎ আছে, ঈশ্বর আছে ; তবে আছে। আর যদি মনে কর কিছুই নাই, তবে তোমার নিকট কিছুই নাই। কারণ ঘুমিয়ে পড়্‌লেই যখন কিছু আছে বলেই বোধ হয় না, কিছুর বোধ থাকে না ; আবার চোক মেল্লেই কিছু আছে বলে অনুভূত হয়. তখন ইহা কল্পনা বৈ আর কি ? যদি তুমি আমাকে সৎ বলে মনে কর ত, আমি তোমার নিকট সৎ, আর অসৎ যদি মনে কর ত অসৎ না হয়ে যাই কোথা ? এই বিশ্বাসের উপরই জগৎটা ভাস্‌ছে।

মৃণ্ময় দেব প্রতিমায় তুমি সাক্ষাৎ দেবতা প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস ভক্তি কচ্ছ বলেই তোমার নিকট উগা জাগ্রত, সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু একজন খৃশ্চান কি মুসলমান উহা দেখে হাস্‌ছে আর বল্‌ছে—"লোকটা বাতুল, পুতুল পূজো কর্চ্ছে।" ভাবছে "ওর মধ্যে ঈশ্বর আছে। ঈশ্বর ত আর জায়গা পায় না ? তাই খড় বাঁশ আর মাটীর বোন্দায় তৈরী পুতুলের মধ্যে শেষকাণ্ডে ঢুকছে।" উহাতে অবিশ্বাসীর এই বিশ্বাস। আর বিশ্বাসীর নিকট প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, সাক্ষাৎ চৈতন্য স্বরূপ দেবতা।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর্ত্তে হয়। গুরু নররূপে নারায়ণ, সাক্ষাৎ ভগবান্। বিশ্বাস না কল্লে জগতে কোন কিছুই জানা যায় না, করা যায় না, পাওয়া যায় না, জগতের অস্তিত্বই থাকে না। হাজার জন্মে ও বিশ্বাস না হলে কারু কিছুই হবে না। স্কুলের ছাত্রে যদি 'ক' এ আকার দিলে 'কা' হয় ইহা বিশ্বাস না

করে, তার আর কি শিক্ষা হয়। বিশ্বাস বিনা কিছুই হয় না। দুনিয়াটাই এই বিশ্বাসের মূলে চল্‌ছে। বিশ্বাস চাই। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। প্রথম সৎকথা শ্রবণ কর্ত্তে হয়, শেষে মনে মনে চিন্তা করে বিচার কত্তে হয়, দর্শন কত্তে হয়, অবশেষে পরীক্ষা করে খাঁটী হলে তবে বিশ্বাস করে নিতে হয়। তাহলে আর উহার নড়্‌চড়্ হয় না। যা একবার পরীক্ষা করে ধর্ব্বে, তা আর জীবনে ছাড়্‌বে না। কিন্তু বিনা পরীক্ষায় অন্ধের মত যা তা বিশ্বাস কল্লে বোকা বলে ঠেকে যাবে। তবে জান্‌বে-সব বস্তুর মূলে গুরু চাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই। গুরুই সব। গুরু পূজাই তাঁর প্রত্যক্ষ পূজা।

"ধ্যান মূলং গুরোমূর্ত্তিঃ, পূজা মূলং গুরোপদং,
মন্ত্র মূলং গুরোর্বাক্যং, মোক্ষ মূলং গুরো কৃপা।"

ধ্যান কর্ব্বে শ্রীগুরু মূর্ত্তি, পূজা কর্ব্বে শ্রীগুরুপদ, মন্ত্র বলে গ্রহণ কর্ব্বে শ্রীগুরুর মুখ নিঃসৃত প্রতিবাক্য, আর এতেই শ্রীগুরু সদয় হলে, তাঁর কৃপায়ই মোক্ষ লাভ হবে।

নাম ও ধ্যান।

শব্দ শক্তি—নাম ব্রহ্ম।

সেই কোন্ আদি যুগ হতে আর্য্য ঋষিগণ প্রাতঃশয্যা ত্যাগ করে প্রার্থনা করে আস্ছেন—"হে প্রভু! আমরা যেন কর্ণদ্বারা সর্ব্বদা ভদ্রও পবিত্র শব্দ সমূহ শ্রবণ করি, চক্ষুদ্বারা যেন ভদ্র ও পবিত্র বস্তু সমূহ দর্শন করি, এবং আমাদের মুখ হতে ও যেন সর্ব্বদা ভদ্রও পবিত্র বাক্য সমূহ বের হয়, আমরা যেন পবিত্র ও ভদ্র হই।" শব্দের অদ্ভুত শক্তি। তাই দেবগণও ভদ্রশব্দ শ্রবণ ও কথন কর্ব্বার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা কত্তেন। এই আমরা নানা জনে নানা বিষয়ের আলোচনা কচ্ছি, যাই একটা বাজ পড়ার শব্দ হোল, আর অমনি যার মন যেথানে ছিল, একসঙ্গে ছুটে গিয়ে পড়্‌লে ঐ বাজের গুড়ুম-গুম্ শব্দে। অদূরে ঐ একজন বাঁশী ফুকার্‌লে আর সব কাজে শিথিলতা এসে কান গেল—মন গেল ঐ বাঁশীর তানে। এইই হোল শব্দের মনকে একীভূত কর্ব্বার—জাগ্রত কর্ব্বার শক্তি। একাগ্রতা বা চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগস্থ কর্ব্বার শক্তি। আবার বল্লেম তুমি উঠে যাও, অম্নি উঠে গেলে। বল্লেম পান আন, আন্‌লে। যদি বলি, তুমি আমার প্রিয়, তোমার মতন আর আমার কেউ নয়, শুনে খুব সুখী হলে। আবার যদি বলি—দূর শালা, তুই বড় বেয়াদব, বদ্‌মাস, পাঁজি, অম্‌নি বড় দুঃখিত ও অসুখী হলে। আর আমার মনে ও ভালমন্দ কথার

সাথে ভালমন্দর বিকৃতি এসে গেল। এ কি? শব্দশক্তির খেলা। যখন শালা বল্লেম তখন তোমারও মনে অপবিত্র অসন্তোষের ভাব আস্‌ল, আমার মনে ও আস্‌ল। আর যখন বন্ধু বল্লেম তখন তোমার'ও সন্তোষ ও পবিত্রতার ভাব আস্‌ল, আমার ও তাই আসল। আমার নিকট এগিয়ে দাঁড়ালে, আমিও তোমার নিকট এগিয়ে গেলাম। এইরূপে মিশ্‌তে মিশ্‌তেই সেই একত্বে মিশে যায়। এতদূর শব্দের শক্তি। এই জন্যই শব্দকে শব্দব্রহ্ম নাদ-ব্রহ্ম বা নাম ব্রহ্ম বলে। তাই নাম ব্রহ্মের উপাসনা সারা জগৎ ভরে চল্‌ছে। আর ভারতে উহার এতদূর উৎকর্ষতা হয়েছিল যে, এখনো শব্দ বা সরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কল্পনা ও তার পূজা ঘরে ঘরে হচ্ছে।

মুখে যেই যা আওড়াক্, জগতে নিরাকার বাদী কি বিশুদ্ধ অদ্বৈত ভাবাপন্ন লোক কোটীর মধ্যে ও একজন খুঁজে পাওয়া যায় না। সবই সাকারবাদী। যে নিরাকারবাদী কি অদ্বৈত-বাদী সে কোন কথা বল্‌তে বা কার্য্য কত্তেই পারে না। সমাধিবান্ ভিন্ন কেহ অদ্বৈতবাদী হতে পারে না। অদ্বৈতবাদীর ইন্দ্রিয়গণ থাক্‌তে ও অচল, কর্ম্ম শক্তি রহিত হয়ে যায়। কার্য্যই আর তখন থাকে না। তাই জগৎবাসী সাকারবাদী। আকার যুক্ত জীব কেমন করে নিরাকারের ধারণা কর্ব্বে? সাকারের আরাধনা করে করে ধাপে ধাপে উপরে উঠে শেষে নিরাকারে পৌছাতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত বৈদিক জাতি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাবের প্রতীক্ বা প্রতিমায়ই পূজা উপাসনা কচ্ছে।

মোসলমান কি কৃশ্চানেরা মুখে নিরাকার ফিরাকার উচ্চারণ কর্লে ও, বেদশাস্ত্র মুখে অস্বীকার কল্লে ও তারা যথার্থ ভাবে শব্দ প্রতীকের উপাসনা কচ্ছে, বেদের নিয়মই মেনে চল্‌ছে। মুসলমানে "আল্লাহ" এই মহান পবিত্র শব্দে তাঁর মহান সত্তা অনুভব কচ্ছে এবং মক্কায় যে তাঁর প্রকাশ হয়ে ছিল, তা জেনে ঐ দিকেই প্রণাম করে থাকে। আর কৃশ্চানে ও "পরম পিতা" ও বিভিন্ন দেবদেবীর ফটোর পূজা কচ্ছে। বৈদান্তিকেরা নাম ব্রহ্ম বা শব্দ প্রতীকের সাধনা কচ্ছে। ওঁ, হরি, ব্রহ্ম, শিব, সত্য, বন্ধু প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ প্রতীক তাদের রয়েছে। এই সব প্রতীকে পবিত্রতা, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেম এনে দিয়ে পরিশেষে সমাধি মন্দিরে নিয়ে যায়। এই সব শব্দেই সকলে ব্রহ্ম উপলব্ধি কচ্ছে। ব্রহ্মানন্দ পাচ্ছে, ইহাই ব্রহ্ম। এই নাম ব্রহ্মের সাধনায় এ দেশে অপূর্ব্ব আনন্দ স্রোতঃ বয়ে গেছে। তাই ভক্তে গায়—"যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজনিষ্ঠা করি,
নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি।"

সমস্ত ধর্ম্মেই নাম কীর্ত্তনের স্থান অতি উচ্চে। এই কীর্ত্তনে স্বাধীনতা এনে দেয়, নিদ্রিত কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করে দেয়, পবিত্রতা, জ্ঞান-ভক্তি প্রেম-মুক্তি এনে দেয়। যোগীরা এই নাদ যোগেই যোগস্থ হয়ে সহস্রারে সেই ব্রহ্ম জ্যোতিঃ দর্শন করে তাঁতে সমাধিস্থ হয়ে যায়।

ওঠা নামার একই পথ। যে পথে ওঠা যায়, সে পথে নামা ও যায়। যেখানে ভাল, মন্দ ও সেইখানে। একই পত্রের

নীচের আর উপরের পিঠমাত্র। মন্দ ত্যাগ কত্তে হলে ভাল ও ত্যাগ কত্তে হবে। তবে আগে ভাল ধরে মন্দ ত্যাগ কর্ে, শেষে ভাল মন্দ দুইই ত্যাগ কত্তে হয়। যা'ক, যে সকল শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে পবিত্র হওয়া যায়, উহা দ্বারা যেমন জীবের মঙ্গল সাধন হচ্ছে; তেমন আবার কতকগুলো শব্দ আছে, যা পূর্ব্বে আর্য্যগণের সংস্কৃত ভাষায় স্থান পায় নাই, এমন ঘৃণিত, অকথ্য, অন্যের মর্ম্মভেদী শব্দ সকল দ্বারা ও সর্ব্বদা সর্ব্ব দেশের বড় অমঙ্গল সাধন হচ্ছে। তাই সর্ব্বদা পবিত্র, সৎ ও ভদ্র বাক্য উচ্চারণ কর্ব্বে। উহার প্রভাবে শীঘ্রই তোমাকে সৎ ও পবিত্র করে তুল্‌বে। তদ্রূপ অশ্লীল, অসৎ বাক্য ও কখনো বল্‌বে না, শ্রবণ কর্ব্বে না। উহার প্রভাবে নেমে পড়্‌বে। সর্ব্বদা মনে মনে, উচ্চৈঃস্বরে, জোরে বল্‌বে মহাশক্তি মহাপ্রেম, পবিত্রতা, আনন্দ, নিত্য, সত্য চৈতন্য, তেজঃবীর্য্য, ব্রহ্ম-বন্ধু, তত্ত্বমসি, ওম্‌হ্রীম্‌। সব দৈন্য-জাড্য-দাস্য, ভাব দূর হয়ে যাবে, ব্রহ্মভাব উদ্দীপিত হবে।

নাম কেমন অবস্থায় কি প্রকারে নিতে হয়।

নাম নেওয়া কি সোজা? প্রভু গৌরাঙ্গদেব নাম নেওয়ার সুন্দর ও সহজ ফন্দি বের করে দিয়েছেন:—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মান দেন্ত কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি।"

তৃণ হতেও নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, গোড়ায় কুড়ুল মার্‌লেও, ছায়া দেবে. মাথায় ঢিল ছুড়্‌লে ও ফল দেবে; অর্থাৎ অপকার

করলে ও উপকার কর্ব্বে, নতগুণী হয়ে আপন বলে প্রেম কর্ব্বে। আর নিজে সম্পূর্ণ মান অহঙ্কার ত্যাগ করে অন্যকে মান দেবে, এইরূপে পবিত্র ও সংযত হয়ে সদা নাম কীর্ত্তন কর্ব্বে। তবে প্রেম হবে। হ্যারে, নাম যে মহাশক্তি। কলিতে নাম ভিন্ন অন্য গতি নাই। "হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্,
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

আর গতি নাই। সর্ব্বদা জোরে, উচ্চস্বরে বল্‌বে,—যেন সকলে শুনে ও পবিত্র হয়ে যায়,—"জয় হরিবল, গৌরহরি বল. হরি হরি বল।" সব পাপ তাপ দূর হয়ে যাবে। এ পবিত্র নাম সর্ব্বদা সকল সময় নেবে। কে বল্‌ছে নাম নিতে হবে মালা তিলক ফোটা কেটে? টুপ্‌টাপ্‌ চুপ্‌চাপ্‌ করে?—সর্ব্বদা নেবে। ঘাটে মাঠে, মঠে মন্দিরে, হাট্‌তে বস্‌তে, খেতে শুতে, শৌচ-পর্য্যন্ত নেবে। দেখো না, ঐ রুদ্রস্বামী বাহ্যে-প্রস্রাব কচ্ছে, এমন কি নিদ্রায়ও নাম জপ্‌ছে। যা পবিত্র, তা সর্ব্ব সময় সর্ব্ব অবস্থায় পবিত্র। তাঁর নামে আবার অপবিত্র কিরে? সব পবিত্র। সর্ব্ব নির্ম্মল। জ্যোতির্ম্ময়। যখন কাম ক্রোধ কি কোন অন্যায় ভাব মনে জেগে উঠে, তখন বোলো দিকি জোরে "জয় হরিবল্‌।" দেখ্‌বে কোথায় সব পালিয়ে যাবে! যদি তাতেও ইতস্ততঃ ভাব আসে, আমি বলছি-বোলো—"জয় দীনবন্ধু, জয় দীনবন্ধু জয় দীনবন্ধু" শমন পর্য্যন্ত হটে যাবে, কাম ক্রোধ কোন্ ছার? একবার নাম নিলে যত পাপ হরে, জীবের কি সাধ্য আছে, তত পাপ করে? তবে লওয়ার মত

লওয়া চাই। ডাকার মত এক ডাক্ দিলেই তিনি সাক্ষাৎ হন। হরি ব'লে তাঁতে একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়্বে, হরি হয়ে, তন্ময় হয়ে যাবে। তখন আর অন্যবার বল্বার শক্তি থাক্বে না, দরকার ও হবে না। সে তন্ময় কেমন :—

"যাহা যাহা নেত্রে পড়ে, তাহা কৃষ্ণ ময়.
নিজে কৃষ্ণ হয়ে কৃষ্ণ সাগরে ভাসয়।" ইহাই
সমাধি ইহাই সিদ্ধি।

নামের সহিত ধ্যান বা যোগ ও সমাধির সম্বন্ধ।

কিন্তু তা বলে নামকে যেন আবার একেবার সর্ব্বেসর্ব্বা ভেবে বসো না। নাম যেন কাগচি লেবুর রস। যখন অরুচি জন্মে, তখন একটু খেয়ে নিলেই হোল। রোগীকে প্রথম ভাত দিতে হলে যেমন কাগচির রস দিয়ে না দিলে মুখে রোচায় না; আবার ওর এমনই গুণ যে, সব সময়, সবতায় দিয়ে খেলে ও উহার আস্বাদ বৃদ্ধি করে। নাম ও তদ্রূপ, ব্রহ্মে তন্ময় বা ধ্যানস্থ হবার বিশেষ সহায়ক মাত্র। আবার ধ্যান ঠিক হয়ে গেলে, পূর্ণ একাগ্রতা এসে গেলেও ব্রহ্ম রস আস্বাদনের জন্য উহা সময় সময় নিতে হয়। ওতে নিজেরও শান্তি লাভ হয়, অন্যেরও শুনে প্রাণে তৃপ্তি আসে। মুখে নাম নিতে হয়, অবশ্য যার যে নাম মধুর, প্রিয় ও পবিত্র বলে মনে হয়, সে সেই নামই নেবে। আর অন্তরে তাঁর রূপ ধ্যান কর্ব্বে, দর্শন কর্ব্বে। এইরূপ কত্তে কত্তে যখন পূর্ণ ধ্যান বা জ্ঞান সমাধি হবে, তখন আর নামের

৬

কথা দেখ্‌বে মনেই থাক্‌বে না। মুখে শুধু-"ওম্" "ওম্" শব্দ হতে থাক্‌বে, কিন্তু বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে যাবে, দিব্যজ্ঞানের উদয় হবে। ঐরূপে যখন বিশ্ব ছেয়ে যাবে, তখন চক্ষু নানারূপের মধ্য দিয়া একরূপই দেখ্‌বে, কর্ণ নানা বোলের মধ্য দিয়া ঐ এক "ওম্" বোলই শুন্‌বে, রসনা ঐ এক বোলেই শান্ত হয়ে যাবে। স্পর্শেন্দ্রিয়ে তখন এক অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই স্পর্শ হচ্ছে অনুভূতি আস্‌বে। আত্মা পরমাত্মায় মিশে যাবে। এই অবস্থাই ইহাই কীর্ত্তনের চরমোদ্দেশ্য, চরমোৎকর্ষভাব। আর এইরূপে ধ্যানে তাঁতে যোগ ভাবই, তাঁতে একেবারে "তাহা" হয়ে যাওয়াই সমাধা বা সমাধি। এসব বলা কহার বিষয় নয় গো! উপলব্ধির বস্তু। আঙ্গুল কাট্‌লে কেমন বেদনা, তা কি কেউ কাউকে বলে বোঝাতে পারে? যার কেটেছে সেইই জানে, অথবা যদি কেটে দিতে পারে, তবে বোঝাতে পারে কেমন জ্বালা।

———

প্রেম-ভক্তি।

বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য বড় মস্ত জিনিষ। বহু জন্মের তপস্যার ফলে মানবের বৈরাগ্যের উদয় হয়। সমস্ত বিষয় আশয়ে পূর্ণ মাত্রায় বিতৃষ্ণা জন্মে। বিবেকীর তৃষ্ণা একমাত্র ভগবানে। মানুষের যতদিন মুক্তি না হয়, ততদিন সে কোন না কোন একটা নিয়ে থাক্‌তে চায়ই, থাক্‌বেই। কেউ কেউ বিষয় বিষে জর্জ্জরিত হয়ে ও তাই নিয়ে ও রয়েছে ; আবার কেউ বা, যে একটু বুদ্ধিমান্‌, সে খুঁজ্‌ছে,—এ ছাড়া অন্য কিছুতে ও বিন্দুমাত্র ও নিত্যসুখ আছে কি না? "যন্‌ সাধন, তন্‌ সিদ্ধি।" হয় ত এই সময় নিজেই কোন ভক্ত সঙ্গে গিয়ে পড়্‌লে, বা কোন ভক্তই এসে দেখা দিলে। যেই ভক্ত-সেই ভগবান্‌। তার নিকট নিত্য সুখের আভাষ পেয়ে সে অনিত্য সুখের বিদায় দিয়ে তার সঙ্গ নিলে, ক্রমেই শান্তি পেতে লাগ্‌লে, আর উঁহা ছাড়্‌লে না। একেই বলে বিরাগ। একেবারে সব ত্যাগ করে, সবতায় বিরাগ হয়ে একে যে রাগ-অনুরাগ, তাহাই বৈরাগ্য।

সাধারণতঃ দুই প্রকারে জীবের বৈরাগ্যের উদয় হয়। এক সংসারের ধাক্কা খেয়ে, আর ভক্ত সঙ্গে ভগবৎ বিষয়ে অপার-অনাবিল আনন্দ পেয়ে। তবে অবতারের, আবির্ভাব বা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ-নিত্য মুক্ত-নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের ভিন্ন কথা। তারা

নিজেরা মুক্ত থেকেই বদ্ধদের মুক্তির জন্য বদ্ধের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। শুকদেব ত মুক্ত, প্রকাশ্য মুক্ত হয়েই জন্মে ছিলেন।

এই বৈরাগ্য আস্‌লে পর তাঁতে-ভগবানে ক্রমে ক্রমে এমনই টান্ বাড়্‌তে থাকে যে, তাঁকে না দেখে আর থাকা যায় না, প্রাণ বাঁচে না। এইরূপে যখন প্রাণ যায় যায় এমন অবস্থা হয়, তখনি তাঁর সাক্ষাৎ পায়। এইরূপ প্রাণ যায় যায় অবস্থাই বৈরাগ্যের চরমাবস্থা, পূর্ণ ব্যাকুলতা, পূর্ণ টান।

এই সময় প্রভু ভক্তকে বহু বিপদ আপদ, লোভ প্রলোভনের মধ্যে ফেলে পরীক্ষা করে নেন্। সহজে কি আর তাঁর দয়া হয়। তা হলে ত সকলেই তাকে পেতে পার্ত্তো। তবে যে ছাড়িয়া না ছাড়ে আশ, তার হই দাসের দাস। যে বার বার বিফল হয়ে ও আশা ছাড়ে না, প্রভু তারই দাসের দাস হয়ে থাকেন। আশা ছেড়ো না, আশায় বুক বেন্ধে কাজে লেগে যাও; একদিন মনোসাধ পূর্ণ হবেই হবে। এখানে এসো, আসা ছেড়ো না, আশা ও ছেড়ো না, একদিন সব জ্বালা নির্ব্বাপিত হবেই। অনন্ত শান্তির অধিকারী একদিন হবেই।

তাঁর আকর্ষণ চুম্বকের মত। চুম্বক লোহাগুলি যে যেখানেই, যতদূরেই থাক্‌না, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ টানাটানি আছেই। যখন উহা প্রবল হয়ে উঠে, কাছাকাছি হয়, তখনি পরস্পর মিলে যায়। জীব সকল ও ঐরূপ, প্রত্যেকেই ভগবানের অংশ, বৈচিত্র, তাঁর হতেই এসেছে, তাঁতেই পুনঃ ফিরে যেতে সাধ-টান্ আছেই। জীবাত্মায় পরমাত্মায় স্বভাবতঃই টানাটানি আছে।

যখন উহা নিকটবর্ত্তী হয় জীবাত্মার বদ্ধ দুয়ার খুলে যায়, উভয়ের মিলন হয়। এই টানাটানির গাঢ় অবস্থাই ভাব-প্রেম।

তাঁতে ভালবাসাই ভক্তি। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রকারে তাঁর প্রতি অনুরাগ হওয়াই ভক্তি। এই ভক্তি বা ভালবাসা গাঢ় হলেই ভাব। ভাব হলে উপাস্য ও উপাসক তফাৎ থাকে না। সর্ব্বদা বন্ধুর মত মিলে, গলাগলি হয়ে বিচরণ করে। আর এর পরে প্রেম। প্রেমে আর দ্বৈত নাই। অদ্বৈত। একেবারে সমস্তরূপে তাঁতে মিশে যাওয়া, ভাব সমাধি হয়ে যাওয়া। বস্তুতঃ ভক্তি, ভাব, প্রেম, সমাধি একই বস্তু। কেবল উন্নতির স্তর স্তর হেতু বিভিন্ন নাম হয়েছে।

ভক্তি, ভাব ও প্রেম।

ভক্তের কৃপায়ই ভক্তির সঞ্চার হ'য়ে থাকে। সাধুসঙ্গই ভক্তি লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। যার যা আছে, তার কাছেই তা পাওয়া যায়। তোমার আমের দরকার হলে কাঁঠাল গাছে উঠলে কি হবে? তদ্রূপ ভক্তি-ফল পেতে হলে ভক্তের কাছেই যেতে হয়। "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।" ভক্তি ভক্ত সঙ্গেই জন্মে থাকে। ভক্ত ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি, তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। প্রথমে ভগবৎভক্ত সঙ্গে যেয়ে ভগবৎকথা শুনতে হয়, মনে মনে বিচার করে ধর্ত্তে হয়, বিশ্বাস কর্ত্তে হয়, শেষে কার্য্য কর্ত্তে হয়, তবেই ভক্তিলাভ হয়। আর ভক্তি এলেই ভক্তের ভগবানও এসে উপস্থিত হন।

কিরূপে ভক্তির সঞ্চার হয়।

একদিন বালক ধ্রুব পিতার অবজ্ঞায়, বিমাতার ভর্ৎসনায়

মা’র স্নীতির কোলে এসে কেন্দে ছিল। স্নীতি সাধ্বী সতী, জ্ঞানী রমণী। তাই তিনি পুত্রকে প্রবোধ দিলেন—বাবা, কিসের দুঃখ এতে? যদি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বদুঃখহর হরি দয়া করেন, তবে এ দুঃখ চলে যাবে, হরি যাকে বড় করেন, সেইই বড় হয়। তিনি যদি তোমার’পর সন্তুষ্ট হোতেন, এ দুঃখ কেটে যেতো! শুনে বালক বল্লে—“মা, তাকে কোথায় গেলে পাওয়া যায়? কি কল্লে তিনি খুসী হোন? তিনি কোথায় থাকেন? আমায় বলে দাও মা, আমি এখনি পণ কচ্ছি—যেরূপেই হোক তার সন্তুষ্টি লাভ কর্ব্বোই।” মা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—“বাপুহে, গভীর অরণ্যে বসে যুগ যুগ কঠোর সাধনা ক’রে কত মুণিঋষিরা তাকে পাচ্ছে না, তুই তাকে পাবি কেমন করে? পঞ্চম বর্ষের বালক ধ্রুব এইরূপে মা’র নিকট তাকে পাওয়ার কিঞ্চিৎ সন্ধান পেয়ে, মাতার নিকট হতে বহু কষ্টে বিদায় নিয়ে রাজ্যসুখ লাভার্থে শ্রীহরিকে প্রসন্ন কত্তে বনে চলে গেল। বহুদিন তপস্যার পর শ্রীহরি প্রসন্ন হয়ে এসে দেখা দিলেন এবং মনোমত বর নিতে বল্লেন। তখন ধ্রুব এতদূর সাধনায় অগ্রসর হয়েছিল যে, তার কোন সাধ-কামনাই মনে আস্‌লে না। বল্লে—“হে প্রভু! তোমার নিকট আর কি বর চাব? সকল চাওয়া, সকল পাওয়া তোমাকেই যখন পেয়েছি, তখন আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই বর দাও প্রভু,—“যেন তোমাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে।” দেখো, প্রথম সকাম হয়ে সাধনায় নাম্‌লে,

শেষে নিষ্কাম ভক্তি পেলে, তাঁর দর্শন পেলে।—বাস্তবিক, তাঁর সাক্ষাৎ পেলে, তাঁর সাক্ষাতে তাকে ভিন্ন আর কিছুই কামনা-ভাবনা থাকেনা। এই দেখছ না, অনেকে এখানে সকাম নিয়ে আসে, এ নিব, তা নিব, এটা চাব, ওটা চাব, ইত্যাদি ভেবে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত যারা, তারা যাই সাক্ষাৎ হয়, অমনি সব চাওয়া চাপা পড়ে যায়, পালায়ে যায়। আর চাইতে পারে না। ভাবে, প্রেমে, আনন্দে এতে এমন তন্ময় হয়ে যায় যে, বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত আর থাকে না।

আবার কতজনে দেখ, রাত্রি নাই, দিন নাই, সময় অসময় নাই, আসছেই,—কেউ রোগমুক্তির আশায়, কেউ মিথ্যা মোকদ্দমা হতে অব্যাহতির আশায়, অত্যাচার হতে রক্ষা পাবার আশায়; কেউ পুত্র-কন্যা ধন সম্পত্তির আশায়, নাম-যশঃ, প্রভাব প্রতিপত্তির আশায়, কিন্তু তোমাদের এই সাধুসঙ্গে পড়ে, সাধু বাক্য শ্রবণ করে, সাধু-দর্শন ও স্পর্শন করে, কত জনে মুক্তি পেয়ে বাঁচছে, প্রেম-ভক্তি পাচ্ছে। ভক্ত-সঙ্গেই, সৎসঙ্গেই সব হয়। বিশ্বাসেই বস্তু মিলে।

ভক্তি অমূল্য ধন। কোন কিছুর সঙ্গেই ওর তুলনা হয় না. ভক্তবীর কবীর গেয়েছেন—

ভক্তি অমূল্য ধন।

"অর্ব্বখর্ব্ব লো দর্ব হৈ, উদয় অস্তলৌ রাজ।
ভক্তি মহাত্মা না তুলৈ, এসব কৌনে কাজ ?"

অর্ব্ব খর্ব্ব পর্য্যন্ত ও, যদি তোমার ধনের পরিমাণ হয়, উদয়

স্বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ধরণীর যদি তুমি একছত্র রাজাও হও, কিন্তু তাতে কি হবে? ভক্তির তুলনায় এসব কিছুই নয়! ধূলি পরিমান।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ, সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে কুন্তীকে বর নিতে বল্লেন। কুন্তীদেবী কিছুক্ষণ ভেবে বর চাইলেন—"হে কৃষ্ণ যদি সত্যই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাও, তবে এই বর দাও যেন-সর্ব্বক্ষণই আমার কোন না কোন বিপদ থাকে"। শ্রীকৃষ্ণ হেসে বল্লেন—"এত বর নয়, এযে অভিশাপ। ধন-জন সুখ-শান্তি, স্বর্গ প্রাপ্তি অন্য যা চাও তাই দেবো।" তখন আবার কুন্তীদেবী বল্লেন—"হে দয়াল কৃষ্ণ, যদি পুত্রগণ সহ সাম্রাজ্য নিয়ে সর্ব্বদা সর্ব্বসুখে কাল কাটাই তা হলে সুখ পেয়ে ভুলে গিয়ে একবার আমরা দিনান্তে তোমার নাম নেবো না, স্মরণ কর্ব্বোনা; কিন্তু যদি সর্ব্বদা কোন না কোন বিপদের মধ্যে থাকি, তবে কোন ক্রমেই তোমাকে ভুলে থাকতে, না ডেকে থাকতে পার্ব্বোনা। তোমার প্রতি আমাদের ভক্তি অচলা রবে, আরও দিন দিন বর্দ্ধিত হবে।" শ্রীকৃষ্ণ আর কি করেন? "তথাস্তু" ব'লে ভক্তপদধূলি মস্তকে নিলেন।

এই ভক্তি, এই প্রেম রজ্জুতেই মা যশোদা তাঁকে চিরদিন বেন্ধে রেখেছে। ভক্তরাজ হনুমান্ হৃদয়ে পুরে রেখেছে। আর গোপীগণের কথা কি বলবো! তাঁরা যে প্রেম-স্বরূপা হয়ে প্রেমে ডুবেই আছে। প্রেমে জন্ম, প্রেমে স্থিতি, প্রেমেই লয়। প্রেমেই জগৎ আকাশ পাচ্ছে, আবার প্রেমেই কারণে লয় হচ্ছে।

এই প্রেমই সর্ব্বস্ব! প্রেমময়ই তিনি। সেই অনন্ত সত্ত্বা অনন্ত প্রেমেরই আধার।

ভাব বা এই প্রেমের পাঁচটি স্তর আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্তা প্রেম। শান্তভাবই ভাবের প্রথম। শান্তভাবের বহু ভক্ত আছে। যাদের ভগবানে নিষ্ঠা আছে, ভক্তি-বিশ্বাস আছে, যারা তাঁকে বিশেষভাবে মান্য ও ভয় ক'রে চলে, আর সংসারের প্রতি কিছু বিরাগ,—তারাই শান্তরসের ভক্ত।

ভাব কত প্রকার; উহার লক্ষণ।

এই শান্তভাবে আরাধনা কত্তে কত্তে দাস্যভাবের উদয় হয়। দাস্যভাবে খুব এগিয়ে গেছে। একেবারে তাঁর দাস হয়ে গেছে। তিনি প্রভু, আমি দাস। এভাবে খুব মমতা, শ্রদ্ধা, সম্মান দেখায়। নিজে সতত সন্ত্রস্ত থাকে। তাঁর দাসস্যদাস ভেবে সর্ব্বদা তাঁর সেবা করে, ঐ সেবায়ই তার পরমানন্দের উদয় হয়। দাস্যভাবের ভক্ত—হনুমান, গরুড়, হরিদাস, হীরামন প্রভৃতি ভক্তগণ। আর বর্ত্তমানে ঐ তোমাদের মহাবীরের—অবতার রুদ্রানন্দ। প্রাণ একদিকে আর প্রভুর সেবা একদিকে। প্রভুর ইঙ্গিতে, প্রভুর জন্য হেসে প্রাণ দিতে সদা পরমানন্দ।

রুদ্র যখন প্রথমে এখানে এলে, তখন কথা বলত। ওর কথা খুব মিষ্টি ও গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের দেখে প্রায়ই সকলে ওকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন ক'রে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। আর এখানে আসা অবধিই ওর অবস্থা—"ভাব ছাড়া রসিক রইতে

নাৰ্কে" হয়ে গিছিল। ভাবেই ২৪ ঘণ্টা বিভোর হয়ে থাকত, থাক্‌তে ভালবাসত। এদিকে সময় সময় দু'একটা মধুর কথা ও মধু মুখে বল্‌তে শুনে, লোকে ওর দ্বারা আরো কিছু শুনবার জন্য বায়না ধর্‌ছে। ও কিছুই বল্‌ছে না, ভাব দেখে রহস্যচ্ছলে তাকে বল্‌লেম—"ওগো, কথা বল্‌তে হলে বল্‌তেই হয়, আর না বলার ইচ্ছা হলে একেবারেই না বলা ভাল। কোনও জঞ্জাল নাই। মধু পাবার আশা না থাক্‌লে আর কেউ খোঁচাবেও না।" অম্‌নি কথা বন্ধ করে দিলে। গুরুর মুখের কথাই মন্ত্র জেনে নিলে। প্রবল সান্নিপাতিক জ্বরেও আর ভুলেও কথা বল্লে না। এক জীবন কথা না বলেই কাটিয়ে দিলে। উঃ! কি গুরুভক্তির আদর্শই জগতে রেখে গেল! চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়ে গেল।

গোস্বামী হীরামন বাড়ীর কাজকর্ম্ম ফেলে কেবল-কেবলই হরিঠাকুরের নিকট যেতো দেখে, একদিন তার বাড়ীর অভি-ভাবকেরা মিলে তাকে বেদম প্রহার কল্লে। মা'র খেয়ে গোঁসাই গিয়ে ঠাকুরের নিকট নালিশ কল্লে। 'ঠাকুর' বল্লেন—"তুমিত আমাকে সর্ব্বস্ব দিয়েছ, তবে আমার ও দেহটার উপর তোমার অত মাথাব্যথা কেন? যার যা কর্ব্বার করুক গে। ভালমন্দ, লাভ-লোকসান যাকে দিয়েছ, সেই-ই দেখবে। তুমি কেন?" অম্‌নি চূর্ণ হয়ে চলে গেল! চৈতন্য এল। এবার তার ভাব পূর্ণ হোল। সময় সময় ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে যেতো, হুশ থাক্‌তো না। কোন কাজকর্ম্ম রীতিমত করতে পারত না।

হয়ত জমিতে যেতে পথেই বিভোর হয়ে পড়ে রল'। আর কারু সঙ্গে কথা ও বেশী বল্‌ত না। আবার আপন মনে আপন ভাবে বিড়বিড় করে কি বলত, কেউ তা বুঝতে পার্ত্ত না। পিতামাতা ছিল না। খুড়ো জ্যেঠারা রোগ ভেবে অনেক ঔষধ পত্র জোর করায়ে সেবন করালে, তাতে আরো পাগলামী বেড়ে গেল। শেষে এক মুসলমান ফকিরকে দেখালে। ফকির তার বায়ু প্রবল হয়ে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘট্‌ছে বলে লৌহ দগ্ধ করে তার সমস্ত শরীর পুড়ায়ে দিলে। তবুও তার ভাবের পরিবর্ত্তন হোল না দেখে—হাত পা বেন্ধে হাত-পায়ের প্রতি আঙ্গুলের মধ্যে চৈতন্য করার জন্য খেজুরের কাঁটা বিদ্ধ করে দিলে, শেষে হাতের রোলার দিয়ে মেরে অচৈতন্য করে রাখলে, এতে তার হুশ হওয়া দূরে থাক, আরো বেহুশ হয়ে গেলে। মরবার সময় নিকটবর্ত্তী জেনে ফকির পালালে। খুড়োরা খুনের দায় এড়াবার জন্য রাত্রে মৃত দেহ স্কন্ধে করে ঠাকুরের বাড়ী রেখে গেলে, দেখি ঠাকুর কি করেন! বাঁচে সেও ভাল, মলে ও আমাদের ঘাড়ে দায় চাপ্‌বে না। ভোর রাত্রি ঠাকুর পায়চারী কত্তে বেরিয়েই পায়ে শ্রীরামনের মৃত দেহ ঠেকেছে। তখন ঠাকুর আর কি করেন, তার গায়ে হাত দিয়ে চৈতন্য করায়ে কোলে লইলেন আর বল্লেন—"হয়ে গেছে, যাও, আর তোমার কিছু বাকী নাই। এখন জগতে এই ভাব ছড়াও।" মানুষ ছিল সেই একজন, যেন ভাবের জ্বলন্তমূর্ত্তি! আত্মসমর্পণের পূর্ণ বিকাশ। মানুষ হওয়া, ভক্ত হওয়া শক্ত

কথা! জ্বালে পুনঃ পুনঃ পুড়ে গলে ছেকে শেষে মানুষ হয়।

এর পর সখ্যভাব। সখ্যভাবে সখাভাব। সখা হয়ে তাঁর সেবা করা। আত্ম-সম-জ্ঞান। এভাবে—

"কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়ারণ,
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।"

এইরূপই হোল সখ্যভাবের কাজ। দাস্যভাবে প্রভুকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে করে একেবারে প্রভু হয়ে যাওয়া, তাঁর সমান হয়ে যাওয়া। ব্রজের রাখালগণ এই ভাবের উপাসক। তারা একদিনও শ্রীকৃষ্ণসখা অদর্শন হয়ে থাক্‌তে পারে না, শ্রীকৃষ্ণও তাদের ছেড়ে রইতে পারেন না। তাদের হোল নিষ্কাম-নির্ম্মল ভালবাসা ঐশ্বর্য্যহীন ভালবাসা! উচ্ছিষ্ট ফল মিষ্ট বলে তাঁর মুখে তুলে দিত। উঁচুনীচু প্রভেদ ভুলে গিয়ে কভু তাঁর স্কন্ধে চড়ত, কভু তাঁকে স্কন্ধে চড়াত। তাঁকে রাখালরাজা করে কভু নবপল্লবের শাখা ভেঙ্গে চামর ব্যজন কর্ত্ত, ছত্র ধরত। বন্ধু বিরহ তাদের অসহ্য। নিত্যানন্দ, অর্জ্জুন, বলরাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি মুক্ত পুরুষগণই এই ভাবের ভক্ত।

তারপর আসে বাৎসল্যভাব। ক্রমেই একত্বের দিকে-মিলনের দিকে যাচ্ছে। বাৎসল্যভাবে ভগবান বাল-গোপাল। প্রাণপুত্তলিকা, যথাসর্ব্বস্ব অভিভাবক-অভিভাবিকা হয়ে, মাতা-পিতা হয়ে, গুরু হয়ে কভু পুত্র কন্যার ন্যায়, কভু ভক্তের ন্যায়, ক্ষণে আদর করে, ক্ষণে তাড়না করে, ক্ষণে আবার বক্ষমণি

ব'লে বক্ষে লুকায়ে রাখে। আত্মরূপে আত্মজরূপে সেবা করে, তাঁর মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করে। যেন তাঁর মা বাপ আর কি? মনে হয় যেন কৃত্রিম—মায়া। কিন্তু তা নয়। ওর মধ্যেও সে যে স্বয়ং ভগবান অনন্ত সত্ত্বা সে বোধের কখন অন্যথা হয় না। শান্ত-দাস্য-সখ্য ভাব ও তার মধ্যে থাকে। তবে বাৎসল্যভাবই অধিক থাকে। কিন্তু ভালবাসার প্রভাবেই এমন করে তোলে। রাজা নন্দ, মাতা যশোদা, শচীরাণী, এরা এই ভাবের সাধক।

(শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের পায়ের নীচে একস্থানের "হাঁড়খোজা" অসুখ দেখায়ে প্রায়ই বলতেন)—এটা আমার মায়ের অভিশাপ। মা এখনো যেমন আমাকে স্নেহ করেন, আবার ক্ষণে ক্ষণে কি যেন ভেবে আমার নাম নিয়ে তন্ময় হয়ে যান, ছোট বেলাও ঐরূপ ছিলেন। শুক্‌না কালে প্রায়ই মাঠে "দাঁড়ে" খেলতাম। মা কয়েকদিনই নিষেধ কল্লেন, কিন্তু শুন্‌লেম না। একদিন দৌড়ে খেলার মাঠে যেতেই মা নিষেধ করে বল্লেন—"এরে, হাত পা ভেঙ্গে যাবে, কাঁটাকুটা ফুটবে। যাস্‌না খেল্‌তে। কিন্তু খেলার সঙ্গীদের টানে কি আর না যেয়ে পারি? যেতে দেখেই রাগ করে বল্লেন—"নির্ব্বংশে, আমার কথা যেমন মান্‌লিনে তেমন তোর পায়ে যেন আজ কাঁটা ফুটে।" আহা, "দাঁড়ে খোটে" গিয়ে পা দিতেই মস্ত এক খেঁজুরের কাঁটা বিন্ধলে! আমার কান্না শুনেই ত মা আবার দৌড়ে এসে কত আহা বাহা কত্তে লাগলে। আর তাঁর অভিশাপের জন্য নিজেকে পুনঃ পুনঃ

ধিক্কার দিতে লাগলে। কাঁটা ত সঙ্গীরা টেনে বের করে দিলে। কিন্তু মরা কাঁটা, সবটা বেরুলে না। তাই "হাড়গোজা" হয়ে রয়ে গেল। এখন যখনি এখানে হাত পড়ে তখনি মায়ের সতর্কের কথা মনে পড়ে। মা, বাপ, গুরু এদের কথা মানতে হয়। তাদের অহৈতুকী ভালবাসা, তারা যে স্নেহ করে, ভাল বাসে, তার বিনিময়ে কিছুই কখনো চায় না, শুধুই ভালবাসে, ভালবাসাই তাদের ভালবাসা।

এই বাৎসল্য ভাব হতে আরও যে প্রগাঢ় ভালবাসা তাহাই মধুর কান্তা বা বন্ধু ভাব। স্বামীস্ত্রীতে, বন্ধু-বন্ধুতে যে ভাব, সেইরূপ ভাব। কিন্তু বর্ত্তমানে স্বামীস্ত্রীতে যে ভাব তা এভাবের সঙ্গে তুলনা হয় না। বন্ধুভাবই মধুর ভাব। এ মধুরভাবে সবই মধুর—

"মধুরং মধুরঃ বপুরস্য বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

ইহাই বিশুদ্ধ প্রেম! তার নিকট প্রভুর শরীর মধুর, চলনে বসনে মধুর, হাঁসিটি মধুর, মধুর গন্ধে সব ভর পুর, সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবেই মধুর। মধুর প্রভু! প্রভুই মধুময়! এখানে পূর্ণ অদ্বৈত ভাব! সকল ভাবের পূর্ণ বিকাশ ভাব! এ সেই ব্রজ-গোপীর নিগূঢ় অহৈতুকী মহা প্রেম ভাব। এর পর যা, তা ভাব সমাধি, মহা সমাধি—মহাং নির্ব্বাণ আর বলাবলী, লীলা খেলা নাই। সব সমাধা, সব সমাধা, সব সমাধা, ওম্—ওম্!

(শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব সমাধি)

প্রেম, প্রেমের স্বভাব, ভক্ত ও প্রভু।

ভাব কি? একমাত্র তাঁর প্রতি নির্ম্মল প্রাণ দেওয়া ভালবাসাই ভাব। এতে কোন জাতবিচার নাই, মানামান্ নাই, ভদ্রাভদ্র নাই, 'কোন প্রকার বন্ধনও নাই। মুক্তভাব হইতেই প্রেমের জন্ম। মুক্তি বা পূর্ণ প্রেমভাব একই বস্তু। ভাব সেই অনন্ত প্রেম সমুদ্রেরই "নাছ" উপকূল অংশ। এই ভাব নাছে থাকতেই তরীগুলি প্রেম তরঙ্গে চিৎকাৎ উতল্-পুতল তাল বেতালে নাচতে থাকে, ভাসতে থাকে। যখন মহাসমুদ্রে গিয়ে পোঁছে তখন আর নাচা নাচি নড়াচড়ি নাই! সেখানের ভাব শান্ত প্রশান্ত গম্ভীর স্থির মহামহিয়ান্! ইচ্ছা, অতল তলে ডুবে থাকে কি ভেসে যায়! বড়ই পবিত্র সে মহাভাব! সে শুধু আনন্দ-মহানন্দ পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ!

এই ভাবেই তাঁর লীলা বিলাস! ভক্ত ছাড়া তিনি এক দণ্ডও রৈতে পারেন না, ভক্তেও পারে না। তখন উভয়ের—

"রূপ লাগি আঁখি ঝরে, শুনে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" এই ভাব হয়। চক্ষু সে রূপমাধুরী ভিন্ন অন্য কিছু দেখ্‌তে পায় না, কর্ণ তাঁর মধুময় বাণী, তাঁর মধুময় গুণগান শুনতেই মুগ্ধ হয়ে যায়! নাসিকার নিকট তাঁর মধুর শ্রীঅঙ্গের মধুগন্ধি বৈ আর কিছুই ভাল লাগে না! রসনা তাঁর নাম কীর্ত্তনে ও কথনে এমনই বিভোর হয়ে যায় যে, অন্য কোন বোল উচ্চারণ কর্ত্তে ইচ্ছা করে না। তাঁর মহা প্রসাদ বৈ অন্য রাজভোগেও তৃপ্তি পায়

না। তাঁর সঙ্গে সদা মিলন হয়ে থাক্‌বার জন্য ত্বগেন্দ্রিয় ব্যাকুল হয়ে থাকে। তাঁর নিকট যেতেই চরণদ্বয় আনন্দে নেচে উঠে। তাঁর সেবায়ই হস্তদ্বয় পরম পরিতুষ্টি পায়। তাঁর শ্রীচরণে মস্তক চিরকালের জন্য নুইয়া যায়। আর সেত তার বক্ষমণি, 'হৃদয়ের ধন। অহো, "মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।" কি আর কহিব? কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য সবই তার দিকে ঝুকে পড়ে, তাঁর দাস হতে চায়, দাস হয়ে তাঁর সেবায়ই সুখী হয়। এমন পরম ভাবস্থ মহাত্মার দ্বারা কি আর কোন কর্ম্ম চলে? তার সবই যে তাঁতে সমর্পিত।

"ছোড় দই কুল কি মান ক্যা করে গা কোই?"

জাকে শিরমোরমুকুট, মেবে পতি সোই।" কুলমানের মর্য্যাদা সব ত্যাগ করেছি! কে কি আর কর্বে আমার! যাঁর শিরে ময়ূর মুকুট সেইই আমার একমাত্র পতি একমাত্র গতি! আমার আর কিছুরই দরকার নাই। আমি দুনিয়ার আর কিছুই চাই না। আর কিছুরই ও ঘৃণা লজ্জা বা ভয় রাখি না। ভক্তিমতী মীরাবাঈর এইরূপ ভাব হওয়ায় এইরূপ বল্লে পতি-পুত্র, কুলমান, রাজ্য-সুখটুক সব ত্যাগ করে, সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে একদিন শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-নিবেদন করে, "ঘর কৈল বাহির, বাহির কৈল ঘর" করে ছিল। তাঁর মত সতীতে দেশ ভরে উঠুক গো!

ভাবে মানুষকে উন্মাদ পাগল করে তোলে। প্রিয় বন্ধুকে যদি বহুদিন পর নিকটে পায়, তবে আর তার হিতাহিত জ্ঞান

থাকে না। কোথায় থোবে, কি যে কর্ব্বে আর ভেবে পায় না। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যেদিন শ্রীকৃষ্ণ যেতেন, সেদিন তার কি আনন্দ হোত! তাবে যে সে কোথায় রাখবে সেস্থান খুঁজে পেতো না। একবার বুকে নিত, একবাব মাথায় নিত, আবার কখন কখন বা মুখ চুম্বন কত্তে কত্তে কাম্‌ড়িয়ে চোক মুখ লাল করে ফুলিয়ে দিত! কিন্তু অনন্ত প্রেমের ঠাকুর প্রেমেই যে বান্ধা, যে যা ক'রে সন্তুষ্ট, তাতেই সে সন্তুষ্ট! আবার যখন শ্রীরাধা তাঁকে ঐ অবস্থায় ফিরে পেতো, আর দেখ্‌ত যে চন্দ্রা তাব প্রাণ বল্লভকে ঐরূপ রাক্ষসীর মত কাম্‌ড়িয়ে দিয়েছে, তখন তার প্রতি যে কতখানি রাগ হোত আর বল্‌তো—"প্রিয়কে এই ভাবে কষ্ট দিতে আছেরে! তার সুখেই সুখী হতে হয়। তুমি ভাব সাম্‌লাতে না পেরে সামান্য আত্ম সুখের মোহে পড়ে আমাদের প্রভুকে কাম্‌ড়িয়ে দিলে!" সে তার কত যত্নের কত আদরের ধন! তার বিন্দু কষ্ট ও যে সে সহ্য কত্তে পারে না। সে যে—তারে ফুল বাসরে ফুলের শয্যায় রতন বেদীর উপরে বক্ষে ধরে সমাদরে ভাব্‌ত কমলিনী রাই—উচ্চ কুচের আঘাত লেগে শ্যামাঙ্গে বেদনা লাগে। আহা। রাই যে তারে রত্ন বেদীব উপর ফুলের বাসর সাজায়ে, তারপর ফুলের শয্যা করে তদুপরি কমলিনী আপ্‌নি শয়ন্‌ ক'রে তার বক্ষোপরি জগৎবল্লভ শ্যামকে রাখতেন! তাতে ও সোয়াস্তি নাই, রাই উচ্চ কুচযুগলে হস্ত দিয়ে বল্‌তেন হে কুচদ্বয়, তোমরা কোমল হও, তোমাদের আঘাত লেগে যেন আমার শ্যামাঙ্গে বেদনা না লাগে। এরূপ বল্‌তে বল্‌তে

রাইয়ের কুচদ্বয় কোমল হয়ে গিছ্‌ল। যে সকল রমণীর কুচদ্বয় কোমল, তারা রাধা অংশ স্বরূপিনী, প্রেমিকা ব'লে জানবে। শ্রীরাধাই জগতে শ্রীকৃষ্ণের সম্যক' যত্ন করিতে জানেন। তিনি হলেন ভাবরাজ্যের একচ্ছত্রী সাম্রাজ্ঞী, তাঁর নির্ম্মল নিষ্কাম অমূল্য প্রেমের এক এক ধূলি পরিমাণ পেলে জীব ধন্য হয়ে যায়। প্রেমেই শুধু প্রেমময় বান্ধা! প্রেম বিনা তাকে পাওয়া যায় না, রাধা যায় না। ওগো, সে যে বিনা প্রেম্ সে রীজাৎ নহি!

একদিন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস কল্লে—"সখে, এ জগতে তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—"বৃন্দাবনের ব্রজ-গোপীরাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।" অর্জ্জুন মনে ভাব্‌ছিল শ্রীকৃষ্ণ তাকেই নির্দ্দেশ কর্ব্বেন। কিন্তু তার নাম না বলে গোপীগণের নাম বল্লেন। এতে অভিমানী হয়ে অর্জ্জুন "হুঁ" দিয়ে বল্লে "আমার চেয়েও যে তোমার প্রিয় ভক্ত থাক্‌তে পারে, তা চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করি না।" তচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ উদাসীন ভাবে বল্লেন—"বিশ্বাস না হয়ত গিয়ে পরীক্ষা করে আস্‌তে পার।" অর্জ্জুন তখনি গাণ্ডীব হস্তে বৃন্দাবন যাত্রা কল্লে। সে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্ত্তে পারে, তাকে ভিন্ন জগতে আর কিছু জানে না, মানে না, তার চেয়েও বড় ভক্ত আছে, না দেখ্‌লে স্বস্তি হচ্ছে না। বৃন্দাবনে এসেই অর্জ্জুন কুঞ্জে কুঞ্জে গোপীদের খুঁজে বেড়াতে লাগলে। প্রত্যেক কুঞ্জেই দেখে কুঞ্জবাসিনী নানা বিচিত্র রংএর সাজসজ্জা,

ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে অঙ্গে চন্দন লেপন কচ্ছে। তাদের হাবভাব দেখে কিছুই বুঝে ঠিক কত্তে না পেরে জিজ্ঞেস কল্লে—"ওগো, এখানে গোপীরা থাকে কোথা জান? তারা উত্তর দিলে, "কেন, আমরাই ত এবনে গোপীগণ। তুমি কি চাচ্ছ? তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত বিলাসিনী গোপীদের দেখে একেবারে চটে গিয়ে জিজ্ঞেস কল্লে—"আচ্ছা তোমরাই যদি গোপী, শ্রীকৃষ্ণভক্ত গোপী হও, তবে অঙ্গের অত সাজনা কচ্ছ কেন? চন্দন পর্‌ছ কেন?" গোপীরা বল্‌লে—"মশায়, চট্‌ছেন কেন? এই যে আমরা সেজেছি, চন্দন পর্‌ছি, এ ত সেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গেই। তাঁর এসব অঙ্গ সাজালে, সুন্দর দেখালে তিনি বড় সুখী হন, তাই তাঁর অঙ্গই আমরা সাজাচ্ছি, আদর যত্ন কচ্ছি। এ অঙ্গে ত আমাদের আর বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। সবই যে আমরা তাঁতে সঁপে দিছি।" এবারের উত্তরে অর্জ্জুন আরো রেগে গেছে। ভাবছে ভণ্ডাগুলো আমার সঙ্গে তামাসা কচ্ছে, আর শ্রীকৃষ্ণও তামাসা করে আমাকে এই তামাসা দেখাতে পাঠালে।" আচ্ছা ছুঁড়া দেখি তোরা কেমন শ্রীকৃষ্ণে সব সঁপেছিস্, কেমন বৃন্দাবনে বসে নিজ অঙ্গে চন্দন মেখে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে মাখাচ্ছিস?" বলেই গাণ্ডীবে তীর যোজনা করে তাদের প্রতি ছুড়তে থাক্‌লে। কিন্তু আশ্চর্য্য একে একে তার সমস্ত বাণ শেষ হয়ে গেল, তুণ শূন্য হোল, তবু গোপীগণের অঙ্গে একটি বাণও বিদ্ধ হল না, কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তারা পূর্ব্বের মতই হাস্য মুখে চন্দনই মাখছে। অর্জ্জুন আজ

বিজয় নাম রাখ্‌তে পাল্‌লে না, সামান্য গোপীদের নিকট পরাজিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে, রেগে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হ'ল। সেখানে গিয়ে দেখে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কে যেন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গ বাণে বাণে একেবারে বিদ্ধ করেছে। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্তের স্রোতঃ বইছে। দেখে অর্জ্জুন আরো রেগে গেল। "কে এমন কার্য্য করেছে, বল সখে, এখনই তার সমুচিত শাস্তি দিই।" তখন শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে বল্লে " অর্জ্জুন চিন্‌তে পারছ না? পাগল হয়েছ? দেখ দেখি এ শরগুলো কার? তোমার তূণ শূণ্য কেন? দেখ্‌তে পাচ্ছ না? এসবই যে তোমার কাজ। তুমি বিনা আমার অঙ্গে কে অস্ত্র বিদ্ধ কত্তে পারে? গোপীতে আর আমাতে যে কোনই ভেদ নাই। গোপী অঙ্গও যা আমার অঙ্গও তা। তারা যে সবই আমাতে সমর্পণ করেছে।" তখন অর্জ্জুন লজ্জিত হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প'ড়ে ক্ষমা ভিক্ষা নিলে। শ্রীকৃষ্ণ ও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার শর গুলি খুলে পুনঃ তার তূণে ভরে দিলে। প্রেম কি সোজা? প্রেম কি সামান্যে ঘটে, স্বজনি! প্রেম নয় প্রেম কাঁচাসোনা, প্রেম যেন পরশমণি! প্রেমিকে বলে—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

প্রেম আর কাম আকাশ পাতাল তফাৎ। কামে একাই সম্ভোগ কত্তে চায়, প্রেমে একায় তৃপ্তি হয় না, দশজনে সম্ভোগ করাতেই তৃপ্তি। কাম স্বার্থ, প্রেম নিঃস্বার্থ। কাম সঙ্কীর্ণ,

প্রেম বিস্তৃত। গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণেই ছিল খাঁটি প্রেম ভাব। তাই অত গোপী না হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পূর্ণ হোত না। আর সকল গোপীসহ ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন না হলে পূর্ণানন্দ রাস রস হোত না। প্রেমিকে ভাবে, আমি বন্ধুকে, আমার প্রভুকে নিয়ে আনন্দ পাচ্ছি, অপর সকলে ও আমার বন্ধুকে নিক, পা'ক, পেয়ে আনন্দ পা'ক। তবেই তার সুখের পরিতৃপ্তি।

যারা খাঁটি প্রেমিক, খাঁটি ভক্ত, তারা সেই প্রেমময়ের নিকট কিছুই চায় না, চাইতে পারে না। আর তারা বল্‌তে ও পারে না, কেন প্রেমময়কে ভালবাসে। যদি প্রশ্ন কর, বল্‌বে— "ভালবাসি ব'লে ভালবাসি, ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে বলে ভালবাসি।" দ্রৌপদী একদিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিল "মহারাজ, তুমি সর্ব্বক্ষণই সর্ব্বকার্য্যেই ধর্ম্মকে মেনে চল্‌ছ, রক্ষা করে চলছ, কিন্তু ধর্ম্মত তোমাকে একদিন ও রক্ষা কল্লে না, একবার ও তোমার দিকে চাইলে না?" উত্তর হোল "ঐ প্রশান্ত গম্ভীর মহান্ হিমালয়ের দিকে চেয়ে দেখো,—দেখো, দ্রৌপদী কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। তুমি কি ও সৌন্দর্য্য না দেখে পার? উহা ভাল না বেসে কি পারা যায়? ও ত পাথর, ও তোমায় আমায় কি কাউকে কিছুই দেয় না। কিন্তু ও ভাল জিনিষ কি ভাল না বেসে পারা যায়? ধর্ম্ম ও তাই। ভাল, তাই ভালবাসি। উহা আমাকে কিছু দিক, বা না দিক্। আমি ত আর ধর্ম্ম বণিক নই! ধর্ম্মের বেচাকেনা করিনে! যে ভাল-বাসার প্রতিদান চাবি। আমার স্বভাব, যা ভাল তাই ভালবাসা।

ভালবাসাই ধর্ম্ম। মানুষেতে নিষ্ঠা ভক্তিই মাত্র সার। জীবে দয়া, নামে রুচি, মানুষেতে নিষ্ঠা; ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা। নামেতে রুচি, সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া, আর মানুষেতে—মানুষ ভগবানের বহু মূর্ত্তিতে বিশ্বাস—ভক্তি ও সেবা যে করে সেই ধন্য, সেইই যথার্থ পূজা করে। এছাড়া আর কোন ক্রিয়া নাই, কোন পথ নাই, ধর্ম্ম নাই। সদাই তোমরা প্রেম ছড়াও। প্রেমের নিকট লাভালাভ নাই, জাত বিচার নাই, ভেদাভেদ নাই, ছোট বড় নাই, স্ত্রীপুরুষ নাই, এমন কি জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি স্থাবরে ও নির্ব্বিচারে প্রেম দাও। যাকে সাম্‌নে পাবে তাকেই ধরে প্রেম দাও, কোল দাও, তার সাথে মিশে যাও। আমার এ পঞ্চভৌতিক দেহটাকে শুধু ভাল-বাস্‌লে ভালবাসা হয় নারে! ও আমার নিকট এসে পৌঁছায় না আমার অনন্ত মূর্ত্তি অনন্তরূপ। সব তার মধ্যে আমি আছি। সব তার মধ্যে আমাকে জেনে সবতা নিয়ে থাকো। সবতায় আমাকে দেখে আমাময় হয়ে যাও, আমি হয়ে যাও, ডুবে যাও। ওঁ শান্তি হরি ওঁ।

সাধু-সঙ্গ।

সাধু ভক্তের লক্ষণ কিরূপ।

(শ্রীশ্রীঠাকুর গাইলেন)—

সাধুর সঙ্গেতে প্রাণ জুড়ায় রে,—
শীতল হয় রে তাপিত অঙ্গ।
সাধুর গুণত যায় না বলা,
তার চিত্ত শুদ্ধ অন্তর খোলা,
দর্শনে যায় মনের ময়লা রে—
স্পর্শনে হয় প্রেম তরঙ্গ।
সাধু যদি দয়া করে,
চাঁদ গৌর দিলে দিতে পারে;
আপন রং ধরাইতে পারে রে—
তাইরে বলি অন্তরঙ্গ ॥

আহা, এইই হোল সাধুর স্বভাব। আপন রং ধরায়ে তবে ছাড়ে। তার সঙ্গে প্রাণ শীতল হয়ে যায়, সে যে কি আনন্দ! ওগো সই, সে সঙ্গের সঙ্গী বিনা তা কেউ জানে না। তোমরাই সেই আনন্দ পুরোপুরিভাবে পাচ্ছ! এই স্থানই এখন স্বর্গ, গোলোক ধাম! সাধুসঙ্গ-সাধু-সাধু, ওম্ (ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব সমাধি)।

সাধুরা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।' তারা পূর্ণ, স্বাধীন, স্বাবলম্বী সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্ম জেনে তাঁতে ভক্তিমান্।—তাঁর বিলাস জেনে সকলেই তারা প্রেম করে। জগতে তারাই মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, শত্রুহীন স্বতন্ত্র। তাদের বসুধৈব কুটুম্ব। তারা সুখে দুঃখে স্তুতি নিন্দায় উদাসীন, তাদের দ্বারা কেঁউ উদ্বিগ্নও হয় না, তারাও উদ্বিগ্ন হয় না।—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগত স্পৃহাঃ।" কোন কামনা বাসনা, কোন অহঙ্কার নাই। আছে কেবল দয়া, ভালবাসা, হৃদয়ে প্রেম অনন্ত প্রেম, প্রেমই সর্ব্বস্ব। সৌম্য প্রশান্ত তাঁর মূর্ত্তি।

প্রভু বলেছেন—'আমার ভক্তগণ ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, এমন কি মোক্ষত্ব পর্য্যন্ত চায় না। তারা চায় শুধু আমাকে। আর কিছুতেই তাদের অভিলাষ নাই।" এতদূর না হলে কি ভক্ত হওয়া যায়? ভক্ত হওয়া শক্ত কথা, শাক্তরাই ভক্ত।

যখন রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার ক'রে বন হতে অযোধ্যায় সিংহাসনে এসে বস্‌লেন, তখন একদিন সকলকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। সমস্ত উপহার যখন সকলকে দেওয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় হনুমান এসে উপস্থিত হোল। তখন ঠাকুর আর কি দেবেন? নিজের গলার হার তার গলায় পরায়ে দিলেন! সকলেই হনুর ভাগ্যের প্রশংসা কল্লে। হনুমান্ও পরম সুখী হল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখ্‌লে—হনুমান প্রভুর গলার হারছড়া দাঁতে চিবিয়ে দূরে ফেলে দিলে। দেখে সকলের—বিশেষ লক্ষ্মণের বড় ক্রোধ হোল। সে বল্লে ও বনের

বানর, কলাকচু খেকো জন্তু, ও প্রভুদত্ত হারের মুল্য বুঝ্‌বে কি ?" ভক্ত অপমাননা দেখে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ওর কারণ হনুমানের নিকট শুন্‌তে বল্লেন। লক্ষ্মণের কথায় হনুমান বল্লে—"প্রভু, প্রথমে মনে করেছিলেম—এ প্রভুর গলার হার, এতে বুঝি প্রভুর সত্ত্বা আছে, শান্তি আছে, ভেবে গলায় নিলেম। শেষে যখন দেখ্‌লেম এতে তা নাই, তখন ফেলে দিলেম।" লক্ষ্মণ বল্লে—"তোমার শরীরেত রামচন্দ্রের কিছুই নাই, তবে ওটা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন ?" হনুমান তখন রাগভরে বিরাট মূর্ত্তিতে আপন বক্ষ চিরে ভিতরে সীতারাম যুগল মূর্ত্তি সকলকে দেখায়ে বিস্মিত কল্লে। তার হাড়ে হাড়ে রাম নাম লেখা ছিল। রাম-রূপ ধ্যান কত্তে কত্তে তার শরীর রামবর্ণ হয়ে গিছ্‌ল। আজও সমস্ত কপি জাতি রামবর্ণ ধরে আছে। হনুমানজী ছিল সেযুগে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, ভক্ত অবতার। ভক্তেরই প্রভুদাস। "ভক্তমম মাতা পিতা, ভক্তমম গুরু, ভক্তেতে রেখেছে নাম বাঞ্ছা কল্পতরু।" ভক্তই তাঁর সব। যেখানে ভক্ত, সেইখানেই তিনি। ভক্তের নিকটই তাকে পাওয়া যায়।

সাধুদের চেনা বড় দায়। কেহ কেহ লোকের উৎপাত হতে রক্ষা পাবার জন্য উন্মাদের বেশে ঘুরে বেড়ায়। কেউ কেউবা বালকের স্বভাব নিয়ে চলে যে, কেউই ধত্তে পারে না। আবার কেউ সহজভাবে সাধারণ মানুষের মত সব তা নিয়ে সবার মধ্যে থাকে, অন্তরে অন্তরে সাধুভাব পোষণ ক'রে চলে যায়। আর যারা নিজের জন্য না এসে পরের জন্য আসে—তারা সমস্তই

প্রকাশ্যভাবে বিলিয়ে দেয়। তবে যে যা পাবার উপযুক্ত, সেইই তা পেয়ে থাকে। হারে, সাধু না হলে সাধু চেনা যায় না, ধরা যায় না। আগে সৎ হও, সত্য কথা বলো। সত্য ভালবাসতে শেখো, বিশ্বাস কর, তবে সাধু পেতে পার্ব্বে।

সাধু ও সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য।

রাজার নিকট যেতে হলে যেমন চৌকিদার, দফাদার ফৌজদার, লাট্‌বেলাট প্রভৃতির হাত হয়ে যেতে হয়, তাদের সাহায্য নিয়ে যেতে হয়। তদ্রূপ ভগবানের নিকট যেতে হলেও দারোয়ান, ফৌজদার প্রভৃতি ভক্তদের নিকট হয়ে, তাদের অনুমতি নিয়ে যেতে হয়। নতুবা যাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গ ভিন্ন তাঁর কাছে যাবার আর কোন সরল সোজা পথ নাই, কোন উপায় নাই।

যেমন পণ্ডিত হতে হলে পণ্ডিতের নিকট, উকিল হতে হলে উকিলের নিকট ডাক্তার হতে হলে ডাক্তারের নিকট যেতে হয়, তদ্রূপ সাধু হতে হলে সাধুর নিকট—ভক্তের নিকট যেতে হয়। যার নিকট যা আছে, তার নিকট গেলেই তা পাওয়া যায়। আগুণ গরম, ওর কাছে গেলে গরম পাবে। বরফ ঠাণ্ডা ওর কাছে গেলে ঠাণ্ডাই পাবে। এক এক বস্তুর এক এক রকম স্বাভাবিক গুণ আছে। আর তা নিয়তই চতুর্দ্দিকে ছড়াচ্চে প্রক্ষেপ কচ্চে। ভক্ত ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক। তাঁর পবিত্রতার ঘনমূর্ত্তি। আর তারা মানুষের অতি নিকটবর্ত্তী। এক সূর্য্য যেমন প্রকাশ হয়ে তার কিরণমালায় সমস্ত জগৎ উজ্জ্বল করে দেয়, তেমন যেখানে একজন সাধুব্যক্তি অবস্থান

করেন, তাঁর প্রভাবে তাঁর চতুর্দ্দিকের বহুদূর পর্য্যন্ত পবিত্রতার ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত হয়ে থাকে, সেই রশ্মির মধ্যে যে, যে, যাহা যাহা পড়বে, তারাই আলোকিত হয়ে উঠ্‌বে।

ওগো—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়। তারা আমা বৈ আর কিছুই জানে না, আমি ও তাদের বৈ আর কিছুই জানি না। ভক্ত আর ভগবান এক। লীলায় পৃথক দেখাচ্চে মাত্র।

সৎগ্রন্থ পাঠও সাধুসঙ্গের এক অঙ্গ। উহা সর্ব্বদা সঙ্গে রেখে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ কর্ব্বে, শ্রবণ কর্ব্বে, কীর্ত্তন কর্ব্বে, দশজনকে ও শুনাবে। এতে আত্মা পবিত্র হবে, সৎ হবে। কিন্তু জান্‌বে ভক্তসঙ্গ ভিন্ন তাঁকে পাওয়া যায় না। ভব পারাবারের আর ভেলা নাই—"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা

ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।"

সাধুদের গুণের কথা, সাধুসঙ্গের গুণের কথা একমুখে বলে শেষ করা যায় না। সর্ব্বতীর্থ স্বরূপ তারা। সর্ব্বতীর্থফল দায়ক। তাদের কৃপায় সব হয়। ওঁ মা।

সমাজ তত্ত্ব।

মানব মণ্ডলীকে শান্তিতে রাখার জন্য এক এক মহাপুরুষ এক একটা বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়ে বলে গেছেন। কতকগুলি লোকে কার্য্যের সুবিধার জন্য মহাপুরুষবাণী বা শাস্ত্রের বচন কি প্রথা মনে ক'রে উহা পালন করে চলে, যে উহার অন্যথা করে, তারা তাকে তাদের দলে স্থান দেয় না, বা দিলেও সেই অন্যথার সংশোধন করে নিতে হয়, এই যে একতাবদ্ধ ভাবে জীবন যাত্রা চালাবার প্রণালী ইহাই সমাজ। ঐ নিয়মগুলি পালন না কল্লে সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটে, অন্যায় অধর্ম্ম দেখা দেয়। আর নিয়মিত ভাবে সকলে পালন করে চল্লে কোন অশান্তির কারণ হয় না। এইসব সামাজিক বিধি দেশের অবস্থা ও সময়ানুযায়ী তৈরী হয়, আবার সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে উহা পরিবর্ত্তন করে নিতে হয়। বস্তুতঃ ঐ সব সামাজিক বিধিকে অপরিবর্ত্তনীয় বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়া বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক; কারণ সমাজতত্ত্ব বেদের কর্ম্ম কাণ্ডে, কর্ম্মকাণ্ড পরি-বর্ত্তন শীল, জ্ঞান কাণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় সময়ানুসারে ঐ কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তন না হলে বহুলোকের বহু প্রকারের অভাব ও অশান্তি ভোগ কত্তে হয়। আজ হয়ত এদেশে যা কর্ত্তব্য, হাজার বৎসর

সমাজ ও জাতি, উহার প্রয়োজনীয়তা।

পূর্ব্বে তা এদেশে অকর্ত্তব্য ছিল। হয় ত উহা অন্য দেশে আবার কর্ত্তব্য ছিল। এই রূপেইত সমাজ চক্র ঘুরছে। গরমের সময় একরূপ খাবার পরবার চাই, শীতের সময় আর রূপ খাবার পরবার চাই। শীত প্রধান দেশে একরকম, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অন্য রকম। এসব নিয়ম ভাল। কিছু কিছু বন্ধন থাকা ভাল, কিন্তু তাই বলে অতিরিক্ত ভাল নয়! অতিরিক্ত নিয়ম-আচারকে অত্যাচার অতি-আচার বলে। অসুবিধা হলে চির-কালের জন্য কোন অপরিবর্ত্তনীয় বন্ধনকেও মেনে চলতে নাই। অনেক মুক্ত পুরুষেও দেশের দশের উপকারার্থে কতকগুলো সু-নিয়ম পেলে চলে থাকেন। কিন্তু তাদের নিজেদের জন্য কিছু মান্‌বার পাল্‌বার দরকার থাকে না। তবু তারা দশের জন্য স্বেচ্ছায় বন্ধন পরে নেয়।

প্রাকৃতিক জাতি দুই প্রকার-পুরুষ ও প্রকৃতি। তা ছাড়া—মনুষ্য, পশু পক্ষী, বৃক্ষলতা তীর্য্যগাদি বহু জাতীয় প্রাণী আছে, তাদের ও এক এক জাতি বলে। ইহা ঈশ্বর স্বষ্ট। কিন্তু ইহা ভিন্ন গুণানুসারে মানব সমাজে যে জাতি বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল, যা এখনো একটু আছে তা ভাল! উহাতে সম্মুখে উচ্চ উচ্চ আদর্শ দেখ্‌তে পেয়ে প্রত্যেকেই উন্নতির পথে উঠ্‌তে চেষ্টা কর্ব্বার সুযোগ পায়। এই জাতি তিন প্রকার গুণে তিন প্রকারে বিভক্ত, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ। যারা ব্যবসায় বাণিজ্য করে, পরের বশ্যতা স্বীকার ক'রে চাক্‌রী ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যারা তমঃগুণী তারাই বৈশ্য নামে অভিহিত হয়।

যারা ক্ষেত্রের কার্য্য করে, ফসল উৎপাদন করে, ক্ষেত্র—দেশ শাসন, পালন ও রক্ষণ করে, যারা স্বাধীন, বীর, রজঃগুণী তারাই ক্ষত্রিয় নামে অবিহিত হয়। আর যারা জীবন্মুক্ত সত্বগুণী মহাপুরুষ, যাদের নিজের ব'লে কিছু নাই, কিছু কর্ব্বার ও নাই, যারা নিষ্কাম ভাবে সারা জগতের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম ক'রে থাকে, ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে থাকে, যারা ব্রহ্মকে জেনে অন্যকেও উহা জানাতে চেষ্টা করে থাকে, তারাই ব্রাহ্মণ নামে অবিহিত হয়। আজকাল যাদের সাধু বলে। অর্থাৎ ত্যাগী-কর্ম্মী, মুক্ত পুরুষ শ্রেণী।

এই জাতিত্রয় হিন্দু, মুসলমান, কৃশ্চান বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ নারী, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ প্রত্যেক মানবের মধ্যেই গুণানুসারে রয়েছে। তবে কারু মধ্যে কোনটা বেশী আর কম। যার মধ্যে যেটা বেশী সে সেই জাতীয়ের অন্তর্গত। এই জাতি বিভাগ বহুযুগ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষদর্শী ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল; আজকাল আর সেভাবের—সত্যকার জাতি বিভাগ নাই, হয় না। জাতি গেছে—বংশের মধ্যে, রক্ত মাংসের মধ্যে, ছুঁৎ-মার্গের মধ্যে। গুণের মধ্যে আর কোন জাতি নাই। দেশটা এই করে করে এখন একেবারে উচ্ছন্নের দিকে যেতে বসেছিল। কিন্তু যদিও পূর্ব্বের মত আর জাতি ফিরে পাওয়া যাবে না, আর দরকারও নাই, তবু সব কৃত্রিম জাতি বিভাগ করে এক জাতির দিকে আস্তে হবে। এখন এক জাতিই সব হবে। নতুবা ভারতের উদ্ধার নাই। বৈদিক হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষা

পারে না। তাই সব এক জাতি হতে হবে, দেশে শান্তি আন্তে হবে, শেষে আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ত্রিজাতির সৃষ্টি হবে। বর্ত্তমানে ভারতে বৈশ্য আছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বিরল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিজাতির মধ্যে যথাক্রমে ত্রিগুণের সম্যক প্রকাশ না থাকলে কোন দেশেই কোন কালেই শান্তি থাকে না। উন্নতি না হয়ে অবনতির দিকে যায়। কত শ্রেণীর কত দেশের লোক একারণে ধরা হতে লুপ্ত হয়ে গেছে। সব চাই। সব তাই চাই—বেঁচে থাকতে হলে।

এখন সমাজের ওলট্পালট পরিবর্ত্তন হবে। কে কর্ব্বে, কেমনে হবে, ঠিক কর্ত্তে পার্ব্বে না। আপ্না হতেই সবার প্রাণে আসবে। সকলেই উহার পরিবর্ত্তন আন্‌বে। এ পরিবর্ত্তনে কেউ বাধা দিও না। যে বাধা দিবে, সে পিছিয়ে যাবে। প্রত্যক্ষ কর্ব্বে সমস্ত পুরুষ জাতি তোমাদের ভাই এবং সমস্ত নারী জাতি তোমাদের ভগ্নী। যে, যে উপাসক হোক, তাতে ক্ষতি কি? বরং সে বিষয়ে তাকে সাহায্য কর, নিজেও উপাস্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী রও। যে এর উল্‌টো কর্ব্বে, গোঁড়ামী কর্ব্বে, বীরত্বের সহিত তার প্রতীকার কর, তবেই ত ধার্ম্মিক। যে যেরূপে, যে নামে ডাকে ডাকুক। যদি কেউ তাতে বাধা দেয়, তবে সেত নিজের উপাস্যেরই অপমাননা কচ্ছে। কেন না—বস্তু এক, ইতে নাহি ভুল।

বর্ত্তমানে সমাজের কর্ত্তব্য।

খাঁটি সমাজ বলে কাঁকে? যাহা ধনী-জ্ঞানী, গরীব-মূর্খ

নরনারী, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ সকলেরই সকল প্রকারের অসুবিধা দূর ক'রে সুবিধা এনে দেয়—তাহাই সমাজ। এর মধ্যে কারু একটু কষ্ট অসুবিধা ভোগ কত্তে হলে জানবে যে এ সমাজের মধ্যে গলদ আছে। আর তখনই উহা খুঁজে বের কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে।

মাতৃজাতিকে সমান আসন দাও।

মানুষ ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই স্ত্রী পুরুষ সকলেই সমান ও স্বাধীন। মানুষের মত শ্রেষ্ঠ প্রাণীতে তার অন্যথা হলে চল্‌বে কেন? পাশ্চাত্যে মেয়ে পুরুষ সকলেই সমান ও স্বাধীন, তাই তারা দুনিয়ার রাজা। সমস্ত জগৎ যেন তাদের ইঙ্গিতে চল্‌ছে। সমাজের উন্নতি চাওত মাতৃজাতিকে ওদের মত, এর পূর্ব্ব-পুরুষদের মত স্বাধীন ও সমান অধিকার দিতে হবে। যতদিন ভারতের মেয়ে ও পুরুষে সমান ও স্বাধীন অধিকার পেয়ে আস্‌ছিল, ততদিন ভারতবাসীদের সুখশান্তি ছিল—মেয়েরা অন্নপূর্ণা ছিল। যদি সুখ স্বচ্ছন্দ চাও, তবে মেয়েদের আগে স্বাধীন করে দাও। স্বাধীন হতে তাদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে সাহায্য কর। মনে করোনা যে তা হলে কি শেষে ভাত রেন্ধে খেতে হবে! তা নয়, যার যা সাজে, সে তা সাজ্‌বেই। ওগো, মাতৃজাতিকে সমান আসন দাও। তাদের বন্ধন মুক্ত কর। যেখানে ঐ মায়েরা সুখে থাকে, সেখানে নিজে আনন্দদায়িনী মা বিরাজ করেন। "যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে নন্দ্যন্তে তত্র দেবতা।" "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" 'নারীগণ যেখানে আনন্দে

থাকে, দেবতারা সে গৃহে আনন্দে নৃত্য করে। স্ত্রীজাতিই সমস্ত জগতের আনন্দরূপিনী, আনন্দ দায়িনী। জানবে এক পক্ষে ভর ক'রে যেমন পাখী আকাশে উঠতে পারে না, তদ্রূপ সমাজের অঙ্গদ্বয় নর কি নারী এর একটীকেও বাদ দিয়ে সমাজ উঠ্‌তে পারে না, জাগতে পারেনা। নরনারী নিয়েইত সমাজ, মনুষ্য জাতি।

বিধবা-বিবাহ।

ভারতে বিধবা বিবাহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভ্রূণ হত্যাপাতকে, নারীগণের মর্ম্মভেদী গভীর তপ্ত অভিসম্পাতে থাক্ হিন্দু সমাজ, সমস্ত ভারতবর্ষ ডুবে যেতে বসেছে। আনন্দদায়িনী স্নেহবতী মায়েরা পুত্র-কন্যা হত্যা কত্তে কত্তে রাক্ষসী মূর্ত্তিতে এসে বর্ত্তমানে দেখা দিচ্ছে। রাক্ষসী আর কে? কে কবে কোন্ দেশে শুনেছ—মাতা নিজের সন্তানকে হত্যা করে? পাপ আর কাবে বলে? নরক আর কোথায়? ঘরে ঘরে নরহত্যা, নিষ্পাপ নির্দ্দোষ শিশু হত্যা হচ্ছে, আর তোমরা আরামে উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কচ্ছ? অধঃপাত আর কারে বলে? মানুষ অতি নিম্নে চলে গেলে সে আর উচ্চ ভাব ধারণা কর্ত্তে পারে না। যেখানে থাকে তাহাই ভাল মনে করে। সদসদ্ জ্ঞান হারাবে ফেলে। যদি এরা পুনঃ বিয়ে করে, সন্তান সন্ততি জন্মায়ে সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করে, সুখে স্বচ্ছন্দে থেকে ঘর গৃহস্থালী করে, তাতে কত শান্তি! কত লাভ! তোমার কন্যা-বোনে যদি শান্তি পায় তাতে তোমার অশান্তি কেন? মানুষ যদি তোমরা, উচ্চধর্ম্মী অহিংসধর্ম্মী হিন্দু

যদি তোমরা, ন্যায়বান যদি তোমরা, তবে তোমাদের এমন ঈর্ষা এমন পর-সুখে, আত্মসুখে কাতরতা আসে কেন? এত উৎকণ্ঠা কেন? আমাকে পাগল বলো কেন হে? তোমরাই যে পাগল হয়ে আছো! আমি সত্যি সত্যি দেখি। আর তোমরা পাপকে পুণ্য পুণ্যকে পাপ বলে উল্টা দেখো। তোমাদের মস্তিষ্কই যে বিকৃত। পাগল যে তোমরাই। দেখ্‌ছ না, কোটি মেয়েকে তোমরা রাক্ষসী বনায়ে তাদের মুখের সম্মুখে আহারীয় হয়ে দাঁড়ায়ে আছ, আর তাদের মুখাগ্নি গহ্বরে তোমাদের এ মুষ্টিমেয় হিন্দুর দল পুড়ে পুড়ে ভস্ম হতে কদিন লাগবে?

যদি মুক্তি চাও, প্রকৃত শান্তি চাও,—ও লম্বা লম্বা বুলি ঈশ্বর ফিশ্বর ধর্ম্ম ধর্ম্ম দিয়ে কাজ নাই। ওসব পারো পরে করো, না পারো নাইবা হোল। ঐ সব টুপটাপ, ঢং ঢাং. ছুং ছাং কি ধর্ম্ম হে? ও সব ঢং ঢাং তর্ক যুক্তি, রেখে দিয়ে আগে এই অসহায়া দুর্ব্বলা অশিক্ষিতা, মাতৃজাতির উদ্ধার কর, মুক্তির দোর ছেড়ে দাও, শক্তিময়ী কর। ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে চেচাচ্ছ কেন? চীৎকারে কি কিছু হয়? হয় কাজে। আগে মাতৃজাতির অভাব দূর কর। মাকে মুক্ত কর। উদ্ধার কর, জাগাও।

বিবাহ অর্থ বন্ধন, প্রেমের বন্ধন, পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ হওয়া। ভালবাসায় মিলন হয়ে একযোগে জীবন যাপন করা। এই ভালবাসা এই প্রীতি পুরুষে পুরুষে বা মেয়ে মেয়ে হলে সমাজে বলে বন্ধুত্ব

স্বয়ম্বরে বিবাহ।

আর মেয়ে পুরুষে হ'য়ে একত্রে সমাজ বন্ধন ক'রে হ'লে বলে বিবাহ। বিশুদ্ধ প্রেমের মিলন হতে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানই প্রেমিক, বীর স্থির একতাবলম্বী সাধু ও মিলনাকাঙ্ক্ষী হয়। আর বলাৎকার বা কামের উত্তেজনায় ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মে তা অপ্রেমিক, বিভাগকারী, কামুক, খল, অবিশ্বাসী ও বিভিন্নমুখী হয়ে থাকে। আজ কাল হিন্দু সমাজের কৃত্রিম আসুরিক বিবাহের ফলেই হিন্দু সমাজ বিভিন্নমুখী, একতাবিহীন হয়ে, অবিশ্বাসী হয়ে, দয়ামায়াহীন হয়ে, দুর্ব্বল হয়ে দিন দিন ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। এই ধ্বংসের পথ রুদ্ধ কত্তে হলে আবার সমাজে সাবালক অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেছে এমন অবস্থায় ছেলে মেয়েকে পূর্ব্বের ন্যায় স্বয়ম্বর প্রথায়, বর কন্যার পরস্পর প্রাণের মিলন হলে তবে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তবেই তাদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি জন্মিবে, প্রেম জন্মিবে। আর তাতেই সমাজ, প্রেমিক, সৎ, বীর. পণ্ডিত, ও শক্তিবন্ত সন্তান সন্ততি পেয়ে বলী হবে। আবার জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বেদ-বেদান্ত বিকীর্ণ কর্ব্বে। নিজে ধন্য হবে, অন্যকেও ধন্য কর্ব্বে।

ব্রহ্মচর্য্য পালন।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলে মেয়ে উভয়েরই ব্রহ্মচর্য্য পালন ও জ্ঞান অর্জ্জন করাতে হবে। ব্রহ্মচর্য্যই জীবন। ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীই প্রকৃত পূর্ণানন্দের অধিকারী। এই বিশ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ কর, পণ্ডিত হও, বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক পণ্ডিত হও,

যোদ্ধা হও, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে নাও, বুঝে নাও, শেষে যা ইচ্ছা করে বেড়ায়ো। এই বিশ বৎসরের মধ্যেই মানুষের যা হবার তা হয়ে যায়ন অর্থাৎ শরীরের ও মনের পূর্ণ গঠন হয়ে যায়, তারপর আর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, কেবল উহার বিকাশ হতে থাকে, সৌষ্ঠব হতে থাকে। বীর্য্যবান্ ও পণ্ডিত জনক-জননীতে দেশ ভরে উঠুক।

ভারতে বহুকাল পুর্ব্বে বহুকাল পর্য্যন্ত সকল যুবকই ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত থেকে শেষে বিবাহ ক'রে গৃহী হ'ত। তন্মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা ক'রে কীর্ত্তি অর্জ্জন ক'র্‌ত। কার্ত্তিক হ'ত। সকলেই স্বাস্থ্য সম্পন্ন বলবান ছিল। প্রত্যেক যুবক যুবতীরই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে শেষে গৃহী হওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কর্ত্তব্য ধর্ম্ম। নতুবা অনধিকারের পরস্বাপহরণের পাপভাগী হ'তে হয়। ব্রহ্মচর্য্য পালন না ক'রে বিয়ে ক'রে গৃহী হ'য়ে জীবন কাটায়েই ত আজ ভারতবাসী দুর্ব্বল হ'য়েছে। আগে দেহ ঠিক ক'রে নাও, শেষে যা হয় ক'র।

পরিচ্ছদ।

দেশ ও কালের উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ্ পর্‌তে হয়। পরার উদ্দেশ্য লজ্জা নিবারণ করা, শীতাতপ হতে শরীর রক্ষা করা। তার বেশী আড়ম্বর চাক্‌চিক্য করা—বিলাসিতা, বাবুগিরি মাত্র। বিলাসিতা ত্যাগ কর্ব্বে। বিলাসিতায় পেলে আর রক্ষা নাই, ইহকাল পরকাল জাহান্নামে যাবে, নরকে যাবে। যে পোষাকে পবিত্রতা আনে, হৃদয়ে প্রশান্তি আনে তাহাই উত্তম পোষাক। তবে পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন চাই। ময়লা, ছিন্ন বস্ত্র কখন ব্যবহার কর্বে না, ওতে শরীর ও নষ্ট হয়, মনে ও অপবিত্রতা ও নীচতা এনে দেয়।

সদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌বে। পরিষ্কার ও পবিত্রতার জন্যই স্নান কত্তে হয়। শাস্ত্রে আছে—

স্নানাহার।

"জল স্নানং মলত্যাগি, ভস্মস্নানাদ্বহিঃ শুচিঃ।
মন্ত্র স্নানাচ্ছুচিশ্চান্ত জ্ঞান স্নানাৎপরংপদম্॥"

অর্থাৎ জল স্নানে দেহ পবিত্র হয়, ভস্ম স্নানে বাহির পবিত্র অর্থাৎ হিংসা তম প্রভৃতির নাশ হয়, মন্ত্র স্নানে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, আর জ্ঞান স্নানে সেই পরম ব্রহ্মপদ লাভ হয়। দেশের আব্‌হাওয়া বুঝে স্নান কত্তে হয়। বাংলা দেশে অবগাহন স্নান সকলের পক্ষেই উত্তম। আসল কথা মনের পবিত্রতা আত্মার পবিত্রতা চাই।

শরীরের ক্ষয় পূরণ আর বৃদ্ধির জন্যই আহারের প্রয়োজন। ভোগের জন্য, লালসার জন্য যেন না খাও। যাহা আরামপ্রদ, পবিত্রকারী, বলকারী এমন আহার্য্যই আহার কর্বে। "অন্নজল ব্রহ্ম স্বরূপ।" ব্রহ্ম বলে সদা মনে কর্বে। ব্রহ্ম বস্তু কখনো উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র বা ছুঁলে নষ্ট হয় না। শুধু লক্ষ্য রাখ্‌বে উহা পরিষ্কার, টাট্‌কা, স্বাস্থ্যপ্রদ ও পবিত্রভাবে পবিত্র হস্তে তৈরী কি না? নিরামিষ, আহারই উত্তম। ইহা সত্ত্বগুণীর আহার। রজোগুণীর মাছ মাংসই প্রিয়, আর যারা তমঃগুণী তাঁদের বাসী পঁচা ভাল লাগে। যে দেশে যা পাওয়া যায় সে দেশে তাহাই গ্রহণ কর্বে। যতদূর সম্ভব নিরামিষ আহার কর্বে। আর

গো, মহিষ, ছাগী প্রভৃতি মানুষের নিত্য উপকারী জন্তু প্রাণান্তেও নষ্ট করবে না, আহার করবে না। বরং যত্নে ওদের পুষ্‌বে। বিশেষ গো দেবতার মত উপকারী প্রাণী মানুষের আর নাই। এমন উপকারী পশুকে দেবতার ন্যায় যত্ন ও পালন করবে, সুখে থাক্‌তে পারবে। আর যাহাই গ্রহণ করবে অগ্রে তাঁকে, গুরুকে নিবেদন ক'রে, অর্পণ ক'রে, তাঁর প্রসাদ ব'লে গ্রহণ করবে। তাঁর প্রসাদে আর কোন দোষ নাই।

মাদক দ্রব্য কখনও স্পর্শ করবে না। গাঁজা, ভাং, আফিং, মদ চরষ্ থেকে সর্ব্বদা দূরে থাকবে। কলিতে—পাপরূপী কলির চার স্থানে অধিকার—স্বর্ণকার দোকান, অপর বেশ্যালয়। সুরাপান, জীবহত্যা, যে যে খানে হয়। স্বর্ণকারের দোকান, বেশ্যালয়, সুরাপান আর জীবহত্যা, ভ্রূণ হত্যা এই চার স্থান হতে সর্ব্বদা দূরে থাকবে। সব নেশা একমাত্র তাঁতেই করবে—যাঁর নেশায় সারা জগৎ ঘুরছে। অন্য নেশায় কাম কিহে! তিনিই সর্ব্ব নেশাকর।

বৈদিক ধর্ম্মের'পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের-কয়েকটি বাণী।

১। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ।

২। আমরা বৈদিক। পৃথিবীর সমস্ত মানব সম্প্রদায়ই বৈদিক। স্বীকার করুক বা না করুক, কার্য্যতঃ সকলেই বেদ-বেদান্ত মেনে চল্‌ছে।

৩। প্রেম-সেবাই ধর্ম্ম। কাহাকেও কোন প্রকারে কষ্ট না দেওয়াই অহিংসা। অহিংসায়ই উহার জন্ম।

৪। ভক্ত ও ভগবান্ অভেদ। তুমি, আমি আর এই যে দেখ্‌ছ, না দেখ্‌ছ সমস্তই তাঁহাই। সেই অনন্ত সত্ত্বা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ওতঃ প্রোতভাবে রয়েছেন। এইরূপ উপলব্ধি অবস্থাকেই জ্ঞান বলে। জ্ঞানেই মুক্তি এনে দেয়। মুক্তাবস্থা হতেই প্রেমের উৎপত্তি। আর প্রেমেরই চরমাবস্থা জীবের চরমোদ্দেশ্য মহাসমাধি-মহানির্ব্বাণ।

৫। সর্ব্বদা সংজ্ঞানের সৎ বিষয়ের আলোচনা কর্‌বে। পবিত্র ব্রহ্মভাবের উদয় হবে।

৬। বীর্য্য ও সত্যবান্ হও। বীর্য্য ও সত্য স্বরূপই ভগবান্। শারীরিক ও মানসিক সকল দিকেই অনন্ত-বল সম্পন্ন হও। অভী হয়ে জগতে মাভৈঃ বার্ত্তা প্রচার কর। তেজঃ ও পবিত্রতাই ব্রহ্মের স্বরূপ। তাঁর প্রচারই তাঁর প্রকাশ করা।

৭। সদাপ্রফুল্ল পবিত্র ভাব রক্ষা কর্ব্বে।

৮। শান্ত মনে পবিত্রভাবে তাঁর নাম কীর্ত্তন কর্ব্বে। বর্ত্তমান যুগে নাম কীর্ত্তন ও সাধুসঙ্গই সমস্ত ধর্ম্মের একমাত্র সরল ও সোজা পথ। নিরন্তর সাধু সঙ্গ কর। এপথে পদস্খলনের ভয় নাই। সাধুসঙ্গই মোক্ষধাম-গোলোকবৃন্দাবন।

৯। ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ? তাঁকে কোথা ও খুঁজে পাবে না। কারণ তুমিই যে সেই। প্রতি জীবই যে তাঁর বিকাশ। **অনন্তই তাঁর রূপ।** জগতে যা কিছু সবই তিনি। প্রেম! অনন্ত প্রেম! প্রেমময় হযে যাও!

১০। মানুষেব সেবাই মানুষের ধর্ম্ম। এ যুগে যে যাহারে ভক্তি করে সেই-ই তার ঈশ্বর। ভক্তি যোগে সেই-ই তার স্বয়ং অবতার। হ্যারে মানুষই ত অবতার। প্রতি মানুষই ত ভগবান্। এই আমি মানুষ, তোমরা মানুষ, মানুষই ত সব। মানুষ, মানুষ, মানুষ! নাস্তি নাস্তি, নেতি নেতি কিরে? বলো, ভাবো—অস্তি অস্তি, আছি-আছি! সত্য, সব সত্য, সব নিত্য সত্য।

১১। নিজে মুক্ত, স্বাবলম্বী হও। অন্যকেও স্বাবলম্বী হতে সাহায্য কর। তিতিক্ষা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ভিন্ন কিছুতেই উন্নতির দিকে যাওয়া যায় না। যত্নে এসব রক্ষা কর্ব্বে।

১২। সর্ব্বদা কর্ম্ম করে যাও। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করো না। লাভালাভ সেই মহাজনের। তুমি তাঁর কার্য্য

হাসিল করে যেতে পার্লেই হোল, আত্মপ্রসাদ পেলে। আসক্তিই সকল বন্ধনের হেতু। অনাসক্তিই মুক্তি—পূর্ণানন্দ। যখন কর্ম্ম কর্ত্তে কর্ত্তে জগৎময় হয়ে যাবে, ঈশ্বরময় হয়ে যাবে, প্রেমময় হয়ে যাবে; কেবল তখনই কর্ম্ম চলে যাবে। এর পূর্ব্বে নয়।

১৩। সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলোকে টেনে নিয়ে তাঁর সেবায় লাগাও, তাঁতে আসক্ত হও। তা হলে আর তারা অন্য পথে যেতে পার্ব্বে না। তাঁতেই বাধ্য হয়ে রবে।

১৪। তোমার হৃদয় আসন পবিত্র ভক্তি পুষ্পে সাজায়ে রেখে দাও। তাঁর ইচ্ছা হলে এসে বস্‌বেন। তিনি ত আর কিছুর বাধ্য নন! তাঁকে কি বাধ্য করা যায়! তিনি যে স্বেচ্ছাময়! তাঁর দয়ার ওপর নির্ভর করে চলে যাও। তবে পবিত্র স্থান পেলে পবিত্র বস্তু না এসে পারে না। মধু যেখানে মধুকর ও সেইখানে।

১৫। যেমন মাতৃজাতির কৃপা ব্যতীত পুরুষ, মায়া হতে মুক্ত হতে পারে না। তদ্রূপ পিতৃজাতির কৃপা ব্যতীতও নারী মোহ হতে মুক্ত হতে পারে না। অতএব পরস্পরের বন্ধন আল্‌গা করে দাও। উভয়ের মধ্যে তাঁর সত্ত্বা জেনে প্রেমে আনন্দে অভিভূত হয়ে যাও। তন্ময় হয়ে যাও।

১৬। দরিদ্র, নারায়ণের সেবায়, দেশ-দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ কর, আত্মবলিদান কর। অগ্রে তাঁর জ্যান্ত মূর্ত্তি গুলোর পূজো কর, যেগুলো অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে মরে যাচ্ছে। শেষে পাষাণ মূর্ত্তি দেখিও। মানুষই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক।

১৭। গোলমাল করো না। ঈশ-মুশা বল, আল্লা বুদ্ধ হরিকৃষ্ণ বলো, যে যাই ব'লে ডাক, যেই ভাব—ভাবো, সবইত এক। তাঁর রূপইত সর্ব্ব ঘটে। তবে ভাবার-ডাকার কায়দা আছে। যার নিকট যে ভাব, যে আদর্শ, যে নাম, যে রূপ যত নিকটে, যত পরিচিত, তার সেই নামে সেই রূপে নিষ্ঠা তত শীঘ্র ও সহজে এসে থাকে। তাই, নিকট হতে ক্রমশঃ দূর দূর প্রবর্ত্তন কর্ত্তে হবে। তাঁর প্রকাশের যে, যেদিক ধরে, যেভাবে সত্বর মিশ্‌তে পারে, সে তাই করুক্। যতজন, তত মন; যত মত, তত পথ, কারু পথে কেউ যেতে পার্ব্বে না। যার যার পথে সেই সেইই যাবে। তাই পরস্পরকে সাহায্য করো। পথ এগিয়ে-পথ শেষে, শেষস্থানে মিল্লে—একত্বে মিল্লেই সব সন্দেহ, সব বিভিন্নতা, সব তামাসা ঘুচে যাবে। দেখ্‌বে—একই পথ, একই সব।

১৮। একলব্য মেটে দ্রোণে ভক্তি ক'রে তাঁর নিকট হ'তে বাণ শিক্ষা করেছিল। আর তোমরা এই তাঁর জ্যান্ত—অনন্ত মূর্ত্তির ভিতর তাঁর দর্শন পাবে না? বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। সবইত সেই এক। লীলায় বিভিন্ন রং-ফলান মাত্র।

১৯। সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের সাহায্য কর্ব্বে। অতিথি ও অভ্যাগতকে সযত্নে আহার ও বাসস্থান দিয়ে সন্তুষ্ট কর্ব্বে। দীন-দরিদ্র, মূর্খ, আর্ত্ত আতুর, নিঃসহায়, নিরাশ্রয়, নির্য্যাতীত ও দুর্ব্বলকে সর্ব্বদা রক্ষা কর্ব্বে, তাদের যথাসাধ্য উপকার কর্ব্বে। আর সর্ব্বদা সরলত্ব, বিনয়, গাম্ভীর্য্য ও আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চল্‌বে।

২০। মদ-গাঁজা, আফিং ভাং প্রভৃতি মাদক-নেশাকর দ্রব্য চিরকালের জন্য ত্যাগ কর্বে। ভুলে ও উহা স্পর্শ কর্বে না। নেশা একমাত্র তাঁতেই কর্বে। তিনিই সর্ব্বনেশার আধার।

২১। যে সকল প্রাণী সকলের বিশেষ উপকারী যেমন গো, অশ্ব, মহিষ, ছাগী ইত্যাদি, তাদের কখনো হত্যা কর্বে না। ওতে জগতের মহা অনিষ্ট করা হবে। তাদের যত্নের সহিত পরিচর্য্যা কর্বে।

২২। স্বাধীনভাবে পবিত্রস্থানে উপবেশন ক'রে চিত্ত-প্রশান্তকারী পবিত্র ও শরীরের উপাদেয় খাদ্য খাবে। যে কাজই কর্বে তাঁকে শরণ নিয়ে, তাঁর হয়ে তাঁকে অর্পণ ক'রে কর্বে। দেশকাল ও পাত্র উপযোগী অনাড়ম্বর পরিষ্কার পরিচ্ছদ ব্যবহার কর্বে। স্বদেশ জাত দ্রব্য সমূহই ব্যবহার কর্বে। দেব-গুরু পূজায় লাগাবে।

২৩। শুধু পাঠশালাই মানবের শিক্ষা মন্দির নয়। এই সারা জগৎটাই জীবের প্রকৃত শিক্ষা মন্দির। দেশ বিদেশে ভ্রমণ কর, ঘুর, কর্ম্ম কর, করে স্বরখ কর, শেখো। গম্ভীর স্থির ও ধৈর্য্যশীল হও। এক একটা বিষয় নিয়ে এক একটা জীবন কাটিয়ে দাও।

২৪। নানা দেবদেবীর পূজোয় লাভ কি হে? যে কোন এক প্রতীকের সাধনা ক'রে, সেই প্রতীককে জগতের সকল দেবদেবীর ভিতর, সকলের ভিতর, সকল বস্তুর ভিতর বিস্তার ক'রে হরেক রূপে তাঁর সাক্ষাৎ প্রতীকের সেবায় আত্মলাভ কর।

২৫। ভগবান্ কি এতই তুচ্ছ বস্তুরে ? যে তাকে চাকরের দ্বারা আহ্বান কর্ব্বে ? তার দ্বারা পূজো দেবে ? নৈবেদ্য দেবে ? আর তাতে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ কর্ব্বে ? সে কি অত অনাদরের ? সে যে প্রাণের জিনিষ। সে শুধু প্রাণ চায়, সরলতা চায়, বিশ্বাস-ভক্তি-ভালবাসা চায়। সে তোদের বড় মানুষের ধার ধারে না. সে যে সকলের বড়। যে তাকে প্রাণের সহিত ডাকে, সেইই পায়। তাঁর পূজো, তাঁব সেবা কত্তে হয়ত নিজে নিজে কর। নিজহস্তে ফুল বিল্বদলে আত্ম-নিবেদন ক'রে কর। কি দুঃখের বিষয়, লজ্জাব বিষয় যে, হিন্দু জাতি ধর্ম্মে ও এমন পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, তাঁর পূজো তাঁর সেবা অন্যে না করে দিলে হয় না ? মানুষ হসৃত আগে স্বাবলম্বী হ', ভিতরে. বীরত্ব আন্, শক্তিকে জাগাযে তোল, তবে ধর্ম্ম কত্তে পার্ব্বি, সবই কর্ত্তে পার্ব্বি। সে যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম-স্বরূপ! সত্য-ব্রহ্ম-বন্ধু! ওঁ সচ্চিদানন্দ! ওঁ হ্রীম্।

বিবিধ উপদেশ।

তাঁর কৃপা না হলে বহুশাস্ত্র আলোচনা, কি কঠোর তপস্যাদি
ভগবৎ কৃপা। কল্লে ও তাঁকে পাওয়া যায় না, জানা যায় না।
তাঁর দয়া ভিন্ন কেউ সেই আত্মরূপতীর্থে স্নান কর্ত্তে পারে না।
যখন তাঁর বিন্দু কৃপাদৃষ্টি হয় তখন আপনা হতেই সব প্রকাশ
হয়ে যায়। তাঁকে কি ডেকে ডুকে বাধ্য করা যায়! তিনি যে
স্বেচ্ছাময়।

তাঁর দয়া সকলের'পরই সমান। তবে বৃষ্টি যেমন সব
জায়গায়ই বর্ষণ হয়, কিন্তু জল জমে থাকে গিয়ে যেখানে নীচু
দাঁড়াবার স্থান আছে সেইখানে। ঘরের মট্‌কায় কি পাহাড়ের
চূড়ায় দাঁড়ায় না। গড়িয়ে গিয়ে কূয়ায়, হ্রদে পড়ে। তদ্রূপ
তাঁর দয়া ও সকলেরই সমান হলে ও সে দয়া রাখ্‌বার ভাণ্ড
যার আছে, যে ভক্তিভাবে নত হয়ে নীচু হয়ে রয়েছে তার পরই
প্রকাশ পায়। অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায় না
তারা। সে যে ভক্তেরই ভগবান!

সূর্য্য সব জায়গায়ই, সব বস্তুর ওপরই সমভাবে কিরণ
দিচ্ছে। সকলেই ওতে শান্তি পাচ্ছে, কিন্তু যে প্রবল সান্নি-
পাতিক বিকারে ভুগ্‌ছে তার ও কিরণ সহ্য পাবে কেন? সে যদি
তেজের ভয়ে ঘরের কোণে গিয়ে লুকায়ে সূর্য্যের নিন্দা
করে। সূর্য্যের কি দোষ? তোমারই যে দুর্ব্বলতা। তুমি

তোমার নিজের দোষে খেতে পাওনা, পরতে পাওনা, রোগ যন্ত্রনায় ভোগ, একি ঈশ্বরের দোষ ? একি দৈব বিড়ম্বনা ? তুমি না জন্মিতেই তিনি তোমার সর্ব্ববিধ সুখের সামগ্রী জগতে তৈরী করে রেখে দিয়েছেন। চিনে নাও না। তিনি সর্ব্বদাই দয়াময়। দয়া বিতরণের জন্য সদাই হস্ত প্রসারণ করে আছেন। তোমরা নেও, চেয়ে নেও, নেওয়ার উপযুক্ত হয়। তাঁর দয়া রাখ্‌বার পাত্র কর।

তাঁর দয়ার ওপর বিশ্বাস রেখে তাঁতে সব সমর্পণ ক'রে, গা ভাসা দিয়ে চলে যাও। সব তিনি করে নেবেন। তিনি প্রহ্লাদকে অগ্নির কুণ্ডে রক্ষা করেছিলেন, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন, এখনো তিনি সকলকে রক্ষা করছেন, সকলের পর দয়া বর্ষণ করছেন। ধরে নেও, রাখ।

বর্ত্তমান। ভূত ভবিষ্যৎ কিরে ? বর্ত্তমান ! বর্ত্তমানে বর্ত্তমানের কার্য্য করে যাও। যা হয়ে গেছে তা গেছে, যা হবে তা হবে কি না হবে তার নিশ্চয়তা কি ? স্বর্গ নরক, সুখ দুঃখ, পরিণাম, অপরিণাম সবই এই বর্ত্তমানে। বর্ত্তমানেই সব ভোগ করে যেতে হবে। করে যেতে হবে। তবে ভবিষ্যতের জন্য এইটুকু মাত্র দেখ্‌বে যে, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কোন দুঃখের-কোন অসুবিধার দাগ না রেখে যাও।

একটু ভাবো। দীন দরিদ্র, মূর্খ, আর্ত্ত আতুরের দুঃখ কেউ বুঝ্‌লে নারে। গুরু পুরুত, জমিদার তশীলদার আর সুদ খোরের দল শুধু জোঁকের মত শুড়্‌ শুড়্‌ করে এদের রক্তই চুষে খেয়ে

খেয়ে দেশটাকে একেবারে কাঙ্গাল করে ফেলায়েছে। এরা গৃধিণীর চেয়েও হারাম! নিমকহারাম! তোরা একবার ভাব দেখি, একটু ভাব! ভেবে দেখ, কোথায় কোন্ হালে তোরা আছিস্। দুনিয়া বা কোন্ হালে চল্ছে। আর ধনী মানী তোমাদেরও, বলি, তোমরা ও একটু ভাবো, ভেবে দেখ আর কতকাল পায়ের উপর পা রেখে চল্বে? শীঘ্র এর প্রতীকার কর, নতুবা যে যুগ চক্র ফের্ছে, এতে যেমন উচ্চে আছ, তেমন আবার নীচে পড়ে যাবে। এযে জাগরণ যুগ। সকলেই জাগ্বে। তাই শীঘ্র করে দুনিয়ার সব তন্ন তন্ন করে দেখ, দেখে কর্ম্ম পন্থা নির্দ্দেশ করে লও, চলো।

গরীব গরীব, ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে চেঁচামিচি কেন হে? কর্ম্মে নেমে পড়। পরের'পর নির্ভর করে কেউ একমুষ্টি অন্ন বা একটুক্রা ছিন্নবস্ত্রও ব্যবহার কর্বে না। প্রাণ ত একদিন যাবেই। যাক্ না, তবু স্বাধীন ভাবে যত দিন বাঁচা যায় বাঁচো। মনে প্রাণে ভাবো আমি স্বাবলম্বী আমার কোন অভাব নাই। জগতের প্রত্যেক জীবজন্তুই যখন স্বাধীন, তখন আমি পরের অধীনতা স্বীকার করে বাঁচবো কেন! আর কার্য্যে ও উহা পরিণত কর। হ্যারে, আমারে শুধু ভগবান্ ভগবান্ বলে লাভ কি? আমিও এই যেমন মানুষ, তোরাও তেমনই মানুষ। "মানুষ বৈ দুনিয়ায় কিছুই নাই। মানুষের মধ্য দিয়াই সব হয়।

আমার ভক্ত যে হবি, সে আমার মত শক্ত হবি, যে তা না পারবি, সে শুধু কুঁড়ে মানুষের মত বসে বসে ঠাকুর, ভগবান্ ভগবান্ ব'লে আমার নামের—আমার দীনবন্ধু নামের কলঙ্ক করিস্ না।

বিরাটের পূজা কর।

এই যে তোমরা আমাকে, এই দেহটার মধ্যেই মাত্র আমাকে জেনে ভক্তি ভালবাসা জানাচ্ছ, এভক্তি আমাতে খাঁটী খাঁটী ভাবে পৌঁছাচ্ছেনা, আমি ত আর এতটুকু নই! আমি যে বিরাট, অনন্তরূপী-অনন্ত বিশ্বময় বিশ্বম্ভর! এই যে আমার এতটুকুকে ভালবাসছ, এরপর এঁকে যে যে ভালবাসে, তাদের ভালবাস, তোমার স্বপরিবারের মধ্যে আমি আছি জেনে, আর তারা তোমাকে ভালবাসে তাই তুমিও তাদের ভালবাস। এইরূপে স্ব-গ্রামবাসীকে, স্বমতাবলম্বীকে, স্বদেশবাসীকে, পরে এইরূপে এই জম্বুদ্বীপবাসী এই জগৎবাসী সকলেব মধ্যেই তাঁহাব প্রকাশ—তাঁহার সত্ত্বা জেনে ভালবাস, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির পূজা কর। তবেই তাঁহার খাটী খাটী পূজা হবে।

স্ব-ভাব সহসা ছাড়ে না।

একবার ঠাকুর কোল্‌কাতা হতে ট্রেনে আস্‌ছেন, পথে গাড়ীর শব্দ শুনে একদল শূকর দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে কাওরারা (শূকর পালক) হুড়্‌মুড়ায়ে ঢুক্‌ল সেই জঙ্গলের মধ্যে। তা দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন হয়ে গেলেন! চীৎকার করে কেবলই বল্‌তে লাগ্‌লেন—"দেখ-শূকরের পিছে কাওরা

দৌড়ায়; শূকরের পিছে কাওরা দৌড়ায়।” চীৎকার শুনেত বহুলোক জড় হোল। এক ভদ্রলোক বল্লে—“মহাশয়; শূকরের পেছন ত কাওরা দৌড়ায়েই থাকে, তা আপনি ওরূপ বলছেন কেন?” তখন একটু প্রকৃতস্থ হয়ে বল্লেন—“শূকরের পেছন যে কাওরা দৌড়ায় তা আমি জানি। কিন্তু এই দুনিয়ার সব কাওরা হ’য়ে ঐ সংসারের কামিনী কাঞ্চনরূপ শূকরের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে। তাঁহার দিকে একবারও কেউ ফিরে চাচ্ছে না। এমন যে কত কত সোণার মানুষ সব জীবের জন্য এসে, তাদের ডেকে ডেকে চলে যাচ্ছে কেউ যে ফিরেও সেদিকে তাকাচ্ছে না। যার যা স্বভাব তা সহসা সে ছাড়তে পাচ্ছে না। এই যে সুন্দর গাড়ী যাচ্ছে, কত দেশ বিদেশের কত লোক যাচ্ছে, তা না দেখে ওরা দৌড়ালো ঐ কাঁটা বনে শূকরের পেছন। এক পলকও ফিরে চাইলে না। বাঁশী বাজাটা ও বুঝি ওদের কাণে পৌঁছাল না! তিনি যে ধরা দিবার জন্যই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ তাঁকে ধল্লে না। চিনলে না।” শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব বুঝে যাত্রীরা তখন ধর্ম্ম বিষয়ে নানা কথা শুনতে চাওয়ায় ঠাকুর বলতে লাগলেন—দেখো, যে যা ধরে আছে, যে রসে ডুবে আছে, অতি বিষাক্ত হলেও তা ত্যাগ কর্ত্তে সহসা চায় না। মাতালেরা যেমন প্রথম প্রথম সখ করে মদ খায়, শেষে খেতে খেতে মদে এমনই আসক্ত হয়ে পড়ে যে, সর্ব্বস্ব সেজন্য বিক্রীত হ’য়ে গেলে ও আর ছাড়তে পারে না, চায় না। তদ্রূপ এই সংসারের জীবগণ প্রথম প্রথম সখ ক’রে সংসারে প্রবেশ করে, কিন্তু শেষে আর তা ছাড়তে

পারে না। কামিনী কাঞ্চনে এমনই আসক্ত হয়ে পড়ে যে, কেউ ছাড়াতে চেষ্টা কল্লেও, বুঝে নিজের ছাড়তে ইচ্ছা হলেও অভ্যাসের দোষে আর ছাড়তে পারে না। ছেড়ে যাবে কোথায়? ধর্ম্মে কি? একটা চাইত? এই যে পূর্ব্বে এদেশে সতীদাহ প্রথা ছিল, স্বামী মরলে তার স্ত্রীকে জোর করে জীবন্ত ধরে আগুণের মধ্যে দিয়ে পুড়ায়ে মারত, তা না কল্লে তখনকার ধর্ম্ম থাকত না। মহাত্মা রামমোহন রায় এপ্রথা উঠাবার জন্য কত চেষ্টা কল্লেন, পাল্লেন না, শেষে যাই রাজশক্তির আশ্রয় নিলেন, অমনি রাজার আইন বলে দু'দিনের মধ্যে ও কুপ্রথা উঠে গেল, এসব সামাজিক কুপ্রথা উঠান রাজ আইন ভিন্ন ভারী কষ্ট।

একদিন পথে দেখি এক বৃদ্ধ জমির আবর্জ্জনার ধূলা সংসার ও সাধনা। ঝাড়ছে। ধূলায় তার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে কাল মানুষ একেবারে সাদা করে ফেলেছে। নিকটে যেতেই এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালে। গায়ে হাত দিয়ে বল্লেম—এসব কি? সন্ধ্যার সময়, কেমন ক'রে কতক্ষণে এসব ছাপ্ কর্ব্বে? বৃদ্ধ হেসে নদী দেখায়ে বল্লে—"ঐ যে রয়েছে, সারাদিনের ধূলো দিনান্তে একবার ঝাপ্ দিলেই সব সাফ্ হয়ে যাবে।" শুনে বড় আনন্দ পেলাম। এই আমি তোমাদের কাছি। ভয় কি? সারাদিনের সারা সপ্তাহ—মাসের সংসার জমির ময়লা—আবর্জ্জনা লাগাও, ক্ষতি কি? দিনান্তে, মাসান্তেও যদি একবার এতে ঝাপায়ে পড়, আমার নাম উচ্চারণ কর, আমায় সব পাপপুণ্য শোক তাপ সঁপে দাও, নিমেষে সব ত্রিগুণ সাফ্ হয়ে যাবে। আমি

তোমাদের সব গ্রহণ কল্লেম, সংসারী সংসার ত্যাগ কর্ব্বে কেন? ৭ দিনের কাজ ৬ দিনে সেরে একদিন আমার নিকট এসো, এই সাধু সঙ্গে এসে, ব'সো, একমাসের কাজ ২৫ দিনে সেরে, ৫ দিনও যদি এসঙ্গে থাকো, তাতেই সব হয়ে যাবে। সব ময়লা মাটী ধূয়ে যাবে। নির্ম্মল পবিত্র হয়ে যাবে। সংসার ত্যাগ কত্তে হবে না। খুব খেটো, খাটুনিতে থাক্‌লে মন পবিত্র থাকে, স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আমার নাম কর্ব্বে, আর কাজ কর্ব্বে। যার যার আমার এ মূর্ত্তির একবার একটুকুও দর্শন হয়েছে, অন্তিমে তাদের প্রত্যেকেরই মুক্তি জান্‌বে। ভয় নাই! মাভৈঃ! অভী হয়ে নিরন্তর কর্ম্ম কর, আর আমার নাম কর, শরণ মনন কর, আমি তোমাদেরই আছি।

হ্যাঁরে, তোরা ত আমায় চাস্, আমার প্রেম ভালবাসা, দয়া চাস্. কিন্তু শুধু চাইলেই ত সে ধন আর দেওয়া যায় না। আমি তোদের দেওয়ার জন্যই হস্ত উত্তোলন ক'রে সদা দাঁড়ায়ে আছি। কিন্তু দেবো কোথায়? দেবো কাকে? এপ্রেম থোব কোথায়? তোরা আমায় রাখ্‌বি কোথায় বল্‌ত? যে বুকে স্ত্রীকে নিয়ে কাম চরিতার্থ করিস্, কোন্ সাহসে সেই বুকে এ অমূল্য ধন রাখ্‌তে চাস্? কিন্তু তবু আমি যেয়ে থাকি। কিন্তু বড়ই কষ্ট হয় বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারি না। অসহ্য হয়ে চলে আসি। আমি তোদের চাই। কিন্তু তোরা ও আমাকে একটু চা। সৎ হ, জিতেন্দ্রিয় হ, হৃদয় আসন পবিত্র ক'রে বসে থাক্, না ডাক্‌লে ও

বস্‌বার মত আসন না দিয়ে বস্‌তে বল্লেও কি কেউ বসে।

আমি গিয়ে বস্‌বো। বস্‌বার মতন আসন না হ'লে বস্‌তে বল্লেও কি কেউ বসে? হৃদয় আসন পবিত্র কর। যেখানে পবিত্র— সেইখানেই আমার বাস। তোরা সৎ হ, পবিত্র হ, তোদের সকলের চৈতন্য হোক্। ওমা—। (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব সমাধি)

রবিবার। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কোন রোগীর রোগের ব্যবস্থা করে দিতেন, তখন বল্‌তেন—রবিবার পবিত্র দিন। এদিনে বাড়ীতে কেহ কখন মাছ মাংস খাবে না। ঘর দোর লেপে পুছে কাপড় চোপড় ধুয়ে টুয়ে পরিষ্কার হয়ে থাক্‌বে! আর যতদূর পার সংযমী হয়ে আমার শরণ মনন কর্ব্বে। এভাবে চল্লে অগ্নিভয়, সর্পভয়, অকাল মৃত্যুভয়, জলের ভয়, কোন পৈশাচিক ব্যাধির ভয়, কোন ভয়ই থাক্‌বে না। আর সক্ষম হলে সাধ্যমত সাধুদের সেবা কর্ব্বে, তাদের নিয়ে নাম কর্ব্বে, সদ বিষয়ের আলোচনা কর্ব্বে, এতে সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে।

মতে থেকো, মতে থাকা ভাল। মতে থেকো, মতে থাকা ভাল। রাখালের হাতে বা বাঁধা গোছড়ে গরু যেমন সতর্ক না হয়ে পারে না, ফসলের লোভে দৌড় দিলেও খুঁটোয় টান লেগে কি রাখালের সাবধানতায় গোচরে ফিরে আস্‌তে বাধ্য থাকে, তদ্রূপ যে কোন সাধু, মহাপুরুষ, সদ্গুরুর কথা মেনে চল্লে, তাঁর ভাব বা মত মতন চল্‌তে বাধ্য থাক্‌লেও পাপ কার্য্য হতে,—ঐ সাধুর দয়া হতে বঞ্চিত হবার ভয়ে মন ফিরে আসে। অন্যায় কাজ কল্লে প্রভু অসন্তুষ্ট হবেন, তিনি আর ভাল বাস্‌বেন না, তাই নানা প্রকারের প্রলোভনে পড়্‌লে ও গুরুর কথা স্মরণ

হওয়া মাত্রই মনের গতি ফিরে যায়। সে আর অন্যায় করতে পারে না। প্রত্যেকের জীবনই এক এক জনের পর নির্ভর করে থাকা ভাল। আনন্দে থাকা যায়। সমস্তই তিনি নিয়েছেন, সমস্তই তাঁকে দিয়েছি। আমার আবার ভয় কি? অন্যায় করি চুলে ধরে টেনে ফিরাবেন। যা কর্ব্বার তিনিই কর্ব্বেন! আমার শুধু জোর দিতে হবে। একজনের পদে জীবন সপে দাও। জন্মের মত সপে দাও, আর ফিরে উঠায়ো না। জীবনের একটা লক্ষ্য একটা স্থিরতা না থাক্‌লে তার দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

শক্তি অর্জ্জন কর। শক্তিই সমস্ত বাধা বিঘ্নের উপরে কার্য্যকরী, শক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মেই শক্তি উপার্জ্জিত হয়। কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য কর্ম্মই ধর্ম্ম কর্ম্ম।

শক্তি অর্জ্জন কর।

কর্ম্মের মধ্যে কখনো উদ্বেগ এনো না। কর্ম্ম করে যেতে হলে অসীম ধৈর্য্যশীল হতে হয়, নিখুঁত চরিত্রবলে বলীয়ান হতে হয়। চরিত্রবলের মতন আর বল নাইরে।

আরব্ধ কার্য্যের মধ্যে আপ্‌নাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবায়ে রাখ্‌তে পাল্লেই শত বাধা বিঘ্ন, শত দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্য দিয়াও সফলতা এসে যায়ই। আর জান্‌বে—কর্ম্ম আরম্ভ কল্লেই সঙ্গে সঙ্গে শক্তি ও সুবিধা এসে থাকে।

বিনা রক্তপাতে জগজ্জয় কর্ত্তে হলে একমাত্র ভালবাসাই তার প্রধান অস্ত্র জান্‌বে! যে বিশ্বপ্রেমিক সেইই মহাযোদ্ধা, সেইই প্রকৃত জগজ্জয়ীবীর।

প্রকৃত জগজ্জয়ী বীর।

ভিক্ষা করা নিন্দনীয় কখন? যখন উহা নিজের জন্য, নিজের উদর পূর্ত্তির জন্য করা হয়। আর যখন দেশ দশের, গরীব দুঃখীর জন্য অন্ধ আতুরের জন্য করা হয়, তখন ওতে মহাপুণ্য হয়। হৃদয়ের প্রশস্ততা বেড়ে যায়। প্রেম আসে, মুক্তভাব আসে। আর জানবে—ভিক্ষা বিনা জগতে কখন কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

ভিক্ষা করা নিন্দনীয় কখন?

তাঁর নিকট কিছুই চেয়ো না, প্রার্থনা করো না। চাইলে একমাত্র তাঁকেই চাবে। আর যদি কিছু চাবেই তবে এইরূপ ভাবে চাবে :—

প্রার্থনা।

"হে প্রভু! তোমার মহিমা জয়যুক্ত হোক! আমায় সুখে কি দুঃখে রাখো তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমাকে যেন কখনো ভুলিয়া না যাই। আমার সমস্ত চেষ্টা যেন তোমার কার্য্যেই নিয়োজিত হয়। আমাতে যেন তোমার সত্বা প্রকাশিত হয়। তোমার প্রেমপূর্ণ পবিত্রোজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি যেন নিয়তই আমার নয়নদ্বয়ে উদ্ভাসিত থাকে। আমি যেন সদা তন্ময় হয়ে যাই, তন্ময় হয়ে রই।

হে প্রভু! আমার ইন্দ্রিয় নিচয়ে যাহা যাহা অনুভূতি আসে, তাহা যেন তোমার দ্যুতির মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়ে আসে! হে প্রভু! হে আমার প্রাণের বন্ধু! আমি আর কিছুই চাই না, আর কিছুই আমার কামনা নাই, শুধু এই কর প্রভু! তোমার ভক্তগণের মনোসাধ পূর্ণ কর, সকলকেই মুক্ত কর!

হে প্রেমময়! তোমার অহৈতুকী পবিত্র প্রেমে সকলকে শুদ্ধ আমাকে জন্মের মত—চিরদিনের জন্য ডুবায়ে রাখ হে বন্ধু! হে প্রভু! তাহাই কর, তাহাই কর, ওম্—ওম্—ওম্—!

(শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব সমাধি)।

পরিশিষ্ট (ক)।

শ্রীশ্রীদীনবন্ধু প্রণাম।

বুভুক্ষার্ত্তং নিরাশ্রয়ং নির্য্যাতীতং,
বদ্ধং মূর্খং এবং ষড় ভাবম্ দীনম্।
তস্মৈ বন্ধুং যঃ স পরং ভগবানম
দীনবন্ধুং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

নির্য্যাতীত নিরাশ্রয় আর জ্ঞানহীন,
ক্ষুধার্ত্ত ও বদ্ধ আর্ত্ত এই ষড় দীন।
এ দীনের বন্ধু যিনি পরম আশ্রয়,
(সেই) ভগবান্ দীনবন্ধু প্রণমি তোমায়॥

শ্রীশ্রীদীনবন্ধু স্মরণ স্তোত্রাষ্টকম্।

মানবো বাহনং যস্য নরচিত্তং তথাসনং,
মার্জ্জব শাস্ত্র বারিধৌ নিতরাং প্লবতে সদা;

নরাণাং মঙ্গলার্থঞ্চ নরেষু যঃ প্রকাশতে
শ্রীদীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥১॥

পূজোপকরণং যস্য শ্রদ্ধার্ঘ ভক্তি চন্দনং
শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারিণং জ্ঞানময়মকল্মষং
কৃপয়া জ্ঞান হারিণং নমাম্যাত্ম বিভূতয়ে
শ্রীদীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥২॥

ভক্ত মণ্ডল মণ্ডিতং দীনার্ত্ত কল্যাণে রতং
কীর্ত্তনে কথনে চৈব নৃত্যন্তমকুতো ভয়ং
জগন্মঙ্গল মাঙ্গল্যং নমাম্যাত্ম বিভূতয়ে
শ্রীদীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥৩॥

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশেষু জগতঃ সর্ব্বকারণং
অচিন্ত্যাব্যক্ত দেহঞ্চ ব্রহ্মবীজ স্বরূপকং
বাক্যাতীতং ত্রিকালজ্ঞং নমাম্যাত্ম বিভূতয়ে
শ্রীদীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥৪॥

অচলঃ সচলো ভাতি চৈতন্যং লভতে জড়ঃ
যৎ কৃপালেশ মাত্রেণ পঙ্গুর্লঙ্ঘয়তে গিরিং
স দীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥৫॥

অশান্তঃ শান্তিমাপ্নোতি রুগ্নো ভবতি সুস্থকঃ
যৎ কৃপালেশ মাত্রেণ মূকো বদতি ভাসিতং
স দীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥৬॥

অজ্ঞো ভবতি জ্ঞানী চ বদ্ধো মুক্তো মহীতলে
যৎ কৃপালেশ মাত্রেণ স্বনাথঃ সনাথয়তে

স দীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥৭॥

দীনো ধনী হিতো দস্যুঃ সুখী ভবতি পাপভাং।
অসাধুঃ সাধুতা মেতি যৎ কৃপালেশ কারণাৎ
স দীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥৮॥

পরিশিষ্ট (খ)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

যাঁহার পুণ্যাবির্ভাবে অস্পৃশ্য অশিক্ষিত ও চিরনিদ্রিত জনসাধারণ যুগ-যুগান্তরের জাড্যতা-দাস্যতা পরিহার করতঃ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, যাঁহার বুদ্ধের ন্যায় জ্ঞান, যীশুখৃষ্টের ন্যায় প্রেম, রামকৃষ্ণের ন্যায় সরল কথায় শাস্ত্র মীমাংসা ও নেপোলিয়ানের ন্যায় কর্ম্ম তৎপরতা দর্শন করিয়া বঙ্গের ভদ্রাভদ্র বহু নরনারী স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন; যিনি সাম্য—মৈত্রী—স্বাধীনতা ও অভয় অভীঃ বার্ত্তা লইয়া দেশে দেশে ঘরে ঘরে মহামিলনের অফুরন্ত অনিবার্য্য—অনাবিল প্রেমস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন; দীন-দরিদ্র, আর্ত্ত আতুর ও নিরাশ্রয় নির্য্যাতীতের মধ্যেই ভগবানের মূর্ত্তভাবে সদা প্রকাশ, ইহা প্রত্যক্ষ করাইয়া বহুরূপে বহুমূর্ত্তিতে

গণ-নারায়ণের সেবা করিয়া ধন্য হইতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—সেই সান্ত-মানব শরীরে অনন্ত মহাশক্তির বিকাশ, মহামানব অবতার পুরুষই দীনহীন কাঙ্গালের বেশে অপূর্ব্ব তেজঃবীর্য্য ও মহাপবিত্রোজ্জ্বল প্রেমমূর্ত্তিতে প্রেমের পাগল শ্রীশ্রীদীনবন্ধু নামে সুপ্রকাশ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বাটুলচন্দ্র ঠাকুর, মাতার নাম পান্নাময়ী দেবী। জন্মভূমি—ফরিদপুরের অন্তর্গত দেবাসুর গ্রাম। জন্মকাল—১২৮৯ বঙ্গাব্দের ১১ই ভাদ্র বুধবার, কৃষ্ণাষ্টমী, ব্রাহ্ম-মূহূর্ত্ত।

ধন্য ভারতের সেই পুণ্যোৎসব দিবস,—ভাদ্রের সেই পুণ্য মুহূর্ত্ত, ভক্তরাজ বাটুলচন্দ্রের জন্মাষ্টমী মহোৎসব, আর ধন্য পরম ভাগবত গায়ক কবি আনন্দচন্দ্র সরকারের পবিত্র রাম নাম কীর্ত্তনের সেই পবিত্র উচ্ছ্বাস! রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছে, শারদীয় পিককুল আনন্দে কুঁহু দিতেছে, হংস হংসীরা উচ্চৈঃস্বরে হংস মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে, পূর্ব্বাকাশ ক্রমশঃই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে, জগতের জীবগণ মলয়ের হাওয়ায় প্রাণের আরামে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, পবিত্র ওম্কার উদগীতিতে নভোমণ্ডলে অপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রুত হইয়া সকলকেই স্বর্গীয় দিব্যভাবে বিভোর করিয়া দিতেছে, আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া আনন্দ-চন্দ্র ধূয়া দিয়াছেন—"কোথায় রহিলে দয়াল দীনবন্ধু রাম!" আর অমনি অন্দর মহল হইতে মঙ্গল-ধ্বনি শঙ্খকাংশ সহ হুলুধ্বনি উঠিল! মঙ্গলের মধ্যে জগন্মঙ্গলের আবির্ভাব জানিয়া ঐ অবস্থায়ই আনন্দচন্দ্র আঁতুড়ঘরে প্রবেশ

করিয়া পান্নাময়ীকে বলিলেন—"মা কি পেয়েছ? একবার দেখাও দেখি, দেখে জীবন সফল করি।" বলিয়াই তিনি সদ্যজাত শিশুকে কোলে লইলেন, এবং বলিলেন—"মা এঁ যে আমার দীনবন্ধু এসেছে, এঁ যে এবার দীনগণের বন্ধু হয়েই এসেছে, এবার এঁর নাম দীনবন্ধু।" বলিয়া আবার সভায় ফিরিয়া গেলেন, এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণাবলী ও ভবিষ্যৎ কার্য্যাবলীই কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার আবির্ভাব বার্ত্তা প্রথম জগতে প্রচার করিলেন। এইরূপেই এ ভাব রাজ্যের সোণার মানুষ, ভক্তের ন'দের গোরা, সদাপ্রফুল্ল প্রেমময় শ্রীশ্রীদীনবন্ধুর জন্মোৎসব সম্পন্ন হইল!

দেখা যায় যে সকল মহাপুরুষ জগতে ওলট্‌পালট্‌ পরিবর্ত্তন আনিয়া, যুগে যুগে অশান্ত জগতে শান্ত ভাব প্রদান করিতে আসিয়া থাকেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের ভাব সাধারণ মানবের হইতে সর্ব্বপ্রকারে অসাধারণত্ব বৈচিত্র্য-রকমের! এই জন্যই তাঁহাদের পাগল, লেংটা, ক্ষেপা প্রভৃতি উপাধিই শিরোভূষণ হইয়া থাকে। আর কালে উহাই সকলের প্রিয়, সকলের আদুরে নাম হইয়া থাকে। এ অদ্ভুত ভাবের মানুষেই বা তাহার বিপর্য্যায় হইবে কেন? হিংস্র সর্প, কুকুর লইয়া খেলা, ঠাকুর দেবতা লইয়া ঠাকুর সাজিয়া খেলা, সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা হেয় দিব্য দৃষ্টিতে তাহাকেই পূজ্য জানিয়া সম্মান প্রদর্শন করা এবং সাধারণ দৃষ্টিতে যেই মান্য দিব্য দৃষ্টিতে তাহাকেই নিকৃষ্ট জানিয়া অবজ্ঞা করণ, কাহারও স্পর্শ মাত্র

য়োগে শান্তি, কাহারও বা দর্শন মাত্র সদ্যমুক্তি। কতরূপে কত ভাবে কত ভাবের খেলাই এ ভাবের মানুষ খেলিয়া গেলেন!

তাঁহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পূর্ণ সুগঠন প্রেমমূর্ত্তি, কমনীয় ভাব কান্তি, বিশ্ব বিমোহন বাঁকা অরুণ আঁখিদ্বয় যেই ই একবার দর্শন করিত, সেই ই মুগ্ধ হইয়া যাইত। হারানিধি, প্রাণের রতন পাইয়া প্রাণে তুলিয়া লইত! যথার্থ ই শ্রীশ্রীঠাকুর এবার বন্ধু ভাবেই আসিয়াছিলেন। এমন চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি, এমন সর্ব্বস্ব-হরণকারী অহৈতুকী প্রেমভাব জগতে আর দেখা যায় নাই; এত বড় মুগ্ধকারী রূপ, ভাব, যাহা অবাক্মনোগোচরম্, যাহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্য ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শুনা যায় মাত্র; আর আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার পুরুষগণ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আঙ্ক আঙ্ক পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন মাত্র। কারণ বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সংসারে নানা অভাব অনটন আসিয়া পড়ে। যদিও এ মানুষ আঙ্ক আঙ্ক পর্য্যন্ত শিখিয়াছিলেন, তথাপি ইঁহার সরল সুগম্ভীর ও সুমাৰ্জ্জিত ভাষায় বেদ-বেদান্তের গূঢ় রহস্য, জটিল দর্শনের সরল সহজ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলীও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। তাঁহার স্মরণ শক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত গ্রন্থখানি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনর্গল ভাবে আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যাইতে পারিতেন। যে কোন বিষয়ে একটু

উত্থাপন হইয়া গেলেই তাহার সমস্ত টুকুই সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন! যেন সর্ব্বজ্ঞাত্মা, সর্ব্ব কর্ম্ম কর্ত্তারূপেই এ নিঃস্ব দেশে পূর্ণশক্তি লইয়াই এবার প্রভু আসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও কিছু দিনের জন্য পরগৃহে চাকরীও করিতে হইয়াছিল। এইখান হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ম্ম জীবনের আরম্ভ। কেমন করিয়া নিজের জীবন বিপন্ন ও তুচ্ছ করিয়া, ব্যাঘ্রের মুখে সঁপিযা দিয়া ও মনিবের কার্য্যোদ্ধার করিতে হয়, এই একাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রদান করিয়া দাসত্বের আদর্শ, কৃতজ্ঞতার অক্ষয় জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার দাসত্বের শেষ হইল। তিনি সুরগ্রাম হইতে গৃহে ফিরিলেন। এই সময় কবিরসরাজ গোস্বামী তারক একদিন তাঁহার শ্রীমুখে—সুমিষ্ট সুগম্ভীর সুরের একটি সুমধুর গীত শ্রবণ করিয়া এমনই মোহিত হইয়া যান যে, সেইদিন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছয় মাস কাল আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখেন এবং নানাবিধ গীত-বাদ্য ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। পরে বাড়ীতে ফিরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষিকার্য্য, গোপালন ও মুদি দোকানের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া যাওয়ার পরে হঠাৎ একদিন তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং ৫।৬ বৎসর কাল ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্য্যটন ও বহুভাবের বহু সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ করিয়া আবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। বাড়ীতে আসিলে আত্মীয় স্বজনে বিবাহের জন্য কন্যা দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু কোন কন্যাই তাঁহার পছন্দ না হওয়ায় একদিন স্বয়ং ঘটকের সঙ্গে গিয়া ৺গোলোকচাঁদ গোস্বামী বংশ সম্ভূত ৺পূর্ণচন্দ্র গোস্বামীর চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী বিরজা দেবীকে দেখাইয়া দেন। এবং শুভদিনে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে উক্ত কন্যার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ-পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর হইতেই পুনঃ পুনঃ ভাবস্থ হইয়া পড়িতে থাকেন। এক সময় বর্ষা কালে জমিতে জনৈক কৃষকের "বারাসে" গান শ্রবণ করিয়া জলের মধ্যেই ভাবস্থ হইয়া ডুবিয়া থাকেন। দৈব ক্রমে জনৈক পথিক তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া নিজের নৌকায় তুলিয়া বাটীতে রাখিয়া যান। এইভাবে কয়েক বৎসর থাকিয়া আবার দেড়বৎসরকাল নিরুদ্দিষ্ট হইয়া নবদ্বীপ, গঙ্গাঘাট, কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থ স্থানে গিয়া নানাভাবের সাধু সহবাসে কাটাইয়া আসেন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের জ্যেষ্ঠ মাসে একদিবস রাত্রিকালে পাঁচ কাহনীয়া হইতে দেবাসুর যাইবার পথে রাহুথড়ের "আলোক-ডাঙ্গা"র শ্মশান ভূমিতে এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া সমস্ত রাত্রিই সেইখানে সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। অবশেষে রাত্রিশেষে শবদাহকারীদের বিকট হরিধ্বনি শ্রবণে সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় গৃহে ফিরিয়া আসেন। এবং পুনঃ পুনঃ ভাবস্থ হইয়া পড়িতে থাকেন। এই সময় অষ্টবিংশতি প্রকারের দিব্যভাব সমূহ তাঁহাতে সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকিত! অহর্নিশিই ভাবের ঘোরে উন্মাদের ন্যায় পড়িয়া থাকিতেন। অতঃপর এইভাব

লইয়া কলপুর গিয়া শ্রীশ্রীঅম্বিকা দেবী, শ্রীকৈলাস স্বামী, ভক্ত দ্বিজবর প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হইলেন। পূর্ব্বেও ইঁহাদের সঙ্গে ঘণিষ্ঠতম ভাব ছিল। এখন উহা আরো প্রগাঢ় হইয়া প্রকাশ হইল। এখন হইতে সদা সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীঅম্বিকাদেবীর শ্রীশ্রীমনসা তলায় মধুর শ্রীহরি নামে মাতোয়ারা হইয়া পাগল হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। ঐ অবস্থায় যাহাকে যখন স্পর্শ করেন, সেই-ই ভাবস্থ হইয়া পড়িতে থাকে। বহু মৃতকল্প মুমূর্ষু রোগী তাঁহার পুন্যস্পর্শে নবজীবন লাভ করে। এখন হইতে একেবারেই আপনার খেয়ালে চলিতে ফিরিতে লাগিলেন। কাহারও কথায় কর্ণ পাত নাই। ভাদ্রমাসে ভেন্নাবাড়ী হইতে ত্রৈলোক্যনাথ, অশ্বিনীকুমার, অতুল কৃষ্ণ ও সানপুকুরিয়ার নীলকমল এই চারিজনে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁহাদের অঞ্চলে লইয়া যান। এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকেন।

উক্ত বৎসর পৌষমাসে কলপুর হইতে ভেন্নাবাড়ী যাইবার সময় ভক্তগণের মধ্য হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকবার অদৃশ্য হইয়া যান, আবার হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন। কখন উলঙ্গ, কখন বা অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় পাগলের ভাব মত করিতে করিতে চলিতে থাকেন। কখন বা পথের গরু বাছুরকে ধরিয়া কোল দেন, তাদের পিঠে চড়িয়া বসেন, কখন বা দ্বিজবরের স্কন্ধে উঠিয়া চলেন; কখনও বা গালাগালি বকাবকি করেন। এই সব দেখিয়া শ্রীকৈলাস স্বামী তাঁহাকে পাগল বলিয়া, "পাগলচাঁদ" বলিয়া ডাকিতে

লাগিলেন। সেই হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাগলচাঁদ নাম প্রচার হইয়া গেল। আর এতদ্দেশের ভক্তগণের অতিপ্রিয় অতি আদরের ডাক "পাগলচাঁদ" নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। উক্ত বৎসর মাঘী পূর্ণিমার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ভিন্ন সাধারণের মধ্যে তিনি অপ্রকাশই ছিলেন। উক্ত বৎসর ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন শুক্রবার মাঘী পূর্ণিমায় ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া দেবাসুরে ভক্ত-সম্মিলন ও শ্রীশ্রীদীনবন্ধু প্রকাশ মহোৎসব করেন। ঐ মহোৎসবে শত শত নরনারীর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর সু-প্রকাশ হইয়া স্বীয় ভাব জগতে প্রকাশ করিলেন। যে যে দায় লইয়া আসিল, যে যে যাহা যাহা পাওয়ার আশায় আসিল দয়াল পাগলচাঁদ বাঞ্ছাকল্পতরু হইয়া তাহাদের তত্তৎ প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। এবং প্রকাশ করিলেন—"আমিও মানুষ, তোমরাও মানুষ, সকলেই মানুষ এই মানুষ রূপেই ত ভগবান! কোন ভয় নাই। মাভৈঃ মাভৈঃ! আমি আসিয়াছি, আমি আছি! আমাকে বিশ্বাস কর, নির্ভর কর, সঁপে দাও! আমি তোমাদের ভালমন্দ পাপ তাপ সব গ্রহণ করলাম। সর্ব্বদা আমার নাম নিয়ে কাজ কর। জ্ঞানলাভ কর। সত্য ও বীর্য্যবান হও। সকলের মধ্যে সমস্ত বস্তুর মধ্যে আমাকে জেনে সকলকে সবতাকে ভালবাস প্রেম কর। প্রেম প্রেম প্রেমই সব। সকলেই সমান। সকলেই মুক্ত। তাঁর রাজ্যে আবার বন্ধন কিরে? সকলেই সকলের ভাই, ভগ্নী, বন্ধু! আমিও সকলের বন্ধু। বলো বন্ধু—"জয়

দীনবন্ধু" আর ভয় নাই! জগতের দীনগণই আমাদের বন্ধু।" ঐ দিন হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবরাশি জগতে বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল। বহুদূর—দূরান্তর হইতে ধনী জ্ঞানী, দীন-দরিদ্র আর্ত্ত আতুর হিন্দু মুসলমান জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এক মানবজাতি হইয়া আসিয়া, তাঁহার অমূল্য অহৈতুকী দয়া লাভ করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। যে আসিল, এ আপন ভোলা প্রেমের পাগল কাঙ্গালের ঠাকুর দীনের বন্ধু তাহাকেই বন্ধু বলিয়া কোলে লইলেন, বুকে ধরিয়া প্রেমালিঙ্গন দিলেন। দিকে দিকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডান হইল। শঙ্খ শিঙ্গা কাংস, খোল-ঢোল, জয়ডঙ্কা মৃদঙ্গের সঙ্গে মঙ্গলধ্বনি হুলুধ্বনি সমভিব্যাহারে জগন্মঙ্গল "জয় দীনবন্ধু" ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া সেই ভাব রাজ্যের সোণার মানুষ রাজরাজেশ্বরের প্রকাশ বার্ত্তা দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে বিঘোষিত হইল। বিশ্বের মহাপরিবর্ত্তন ভাব—জাগরণ যুগের উদ্বোধন সংজ্ঞাপিত হইল।

সমস্ত বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা, সমাজের ভেদাভেদ উঠিয়া গিয়া সকলেই সমান-মানুষ, তাঁহারই সন্তান, ভাই ভগ্নী—বন্ধুভাব প্রবর্ত্তিত হইল। বহু ভক্ত, সিদ্ধপুরুষ, মুক্তপুরুষ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহার অমিয় সদানন্দময় সঙ্গে মাতিয়া রহিল; কেহ কেহবা বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া ঐ ভাব বিস্তার করিতে বাহির হইয়া গেল। এতদ্দেশে তাঁহার ভক্ত—পণ্ডিত রাইচরণ রায়, গণেশচন্দ্র হীরা, গায়ক কবি গঙ্গাচরণ সরকার, মহাত্মা উমাচরণ ঠাকুর, শুক চাঁদ মজুমদার, সখিচরণ মণ্ডল, গায়ক, কবি

রজনীকান্ত সরকার, রসকবি কুমুদকান্ত দত্ত, উদ্ধবচন্দ্র মজুমদার, দ্বারিকানাথ সরকার, রজনীকান্ত দাশ, যজ্ঞেশ্বর রায়, সাধু রাজকুমার রায়, ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ দাস, ডাক্তার শ্যামলাল পোদ্দার, রসিক, শশী, কানাই কত বলিব,—দেবেন্দ্রনাথ খাঁ, নকুলচন্দ্র মিস্ত্রি, নবকৃষ্ণ শীল, ত্রৈলোক্য নাথ কুণ্ডু, সর্বেশ্বর রাজবংশী, বিষ্ণুদাস মিয়া, মহানন্দ ঢালী, রামদয়াল ঋষি, নৃপেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কালীকুমার মজুমদার, ডাক্তার গনেশচন্দ্র মণ্ডল, জলধর বাণী, সুরেশচন্দ্র ঠাকুর, সর্ব্বত্যাগী মহাবীরের অবতার স্বামী রুদ্রানন্দ, মহাদেব বিশ্বাস, মনোহর ঢালী, নেপাল চন্দ্র বিশ্বাস, মৌলবী লৎফল হাকিম, পণ্ডিত পতিরাম রায়, এই মিশনের সভাপতি স্বামী অমূল্য কৃষ্ণ, চন্দ্রাবলী দেবী, প্রীতিময়ী বিশ্বাস, সরোজিনী মজুমদার, রাসমণি দেবী, মহারাণী দেবী, সীতা দেবী, চন্দ্রকান্ত মণ্ডল, মমতাজ মোল্লা, কামিণী বিশ্বাস, সৌরেন্দ্র কুমার ভাদুড়ী, ভুবনমোহন বসু, কাঙ্গালীবরণ বিশ্বাস প্রভৃতি শত শত নরনারীই তাঁহার জন্য "ঘর কৈল বাহির, বাহির কৈল ঘর"। সকলের এ পাগলচাঁদ সকল জাতির সকলের ঘরেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই পানাহার করিতেন, সকলকেই বন্ধুর মত ভাল বাসিতেন, এ যেন স্ত্রীপুরুষ, যুবা বৃদ্ধ শিশু সকলেরই সকল অবস্থায়ই সমান দরদী। যে গৃহেই যখন যাইতেন, পায়খানা পরিষ্কার হইতে কোঠার আসবাব সাজান পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ কর্ম্মই কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সুন্দর সুশৃঙ্খলরূপে সুসজ্জিত করিয়া, মানুষের বাসের উপযোগী স্থান

করিয়া, মানুষের মত মানুষ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া বাসগৃহেরও আদর্শত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রতি মানুষের—বালযুবাবৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ প্রত্যেকেরই প্রাতরুত্থান হইতে পুনঃ নিদ্রাকাল পর্য্যন্ত এক এক করিয়া সমস্ত দৈনন্দিন কার্য্য নিয়মিতভাবে নিজে করিয়া ও ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া এবং ভক্তগৃহে যাইয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কোণের ঝি, বৌ হইতে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সকলকেই আপনার হইতে আপনার করিয়া তাহাদের প্রিয়তম আত্মীয়ভাবে, বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে তাহাদের হইয়া, তাহাদের মধ্যে যাইয়া তাহাদের মধ্যের সর্ব্বপ্রকারের কু-সংস্কার স্বয়ং সম্মুখে থাকিয়া দূর করাইয়া মুক্তির পথ, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মুক্তির পথ সু-প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে এত সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে যে তাহা বলিতে গেলে দিন-মাস-বৎসর লাগিয়া যায়। এবং অনেকে আমাকে মস্তিষ্ক বিকৃত বলিয়া উপহাস করিতেও বোধ হয় দ্বিধা বোধ করিবে না। কিন্তু "সত্য চির সত্য, ব্যক্ত স্বীয় মহিমায়"। তাই দুই একটি ঘটনা এখানে না প্রকাশ করিলে তাঁহার অমূল্য জীবনের আভাষটুকুও বাকী থাকিয়া যাইবে। তাঁহার জন্মের দুই চারিদিন পর একদিন পান্নাদেবী দ্বিপ্রহরে শিশু ঠাকুরকে লইয়া একাকী আঁতুড়ঘরে ঘুমাইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে জাগিয়া দেখেন—ঘরের চালার ছিদ্র দিয়া প্রখর রৌদ্রতাপ আসিয়া শিশুর মুখে লাগে দেখিয়া এক প্রকাণ্ড সর্প

বিশাল ধবল ফণা বিস্তার করিয়া শিশুকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিতেছে। আর তাহার সঙ্গে শিশু ঠাকুর যেন হাঁসিয়া হাঁসিয়া খেলা করিতেছেন। পান্নাদেবী দেখিয়াই ভীত হইয়া যেই ধাত্রীকে ডাকিলেন, অমনি সর্পটি যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না। পান্নাদেবী স্বয়ং একথা আমাদের কতবার বলিয়া জানাইয়াছেন যে, "এ পাগল সামান্য পাগল নয় রে! এ সেই ব্রজের পাগল! জন্মকাল হতেই দেখে দেখে বুঝে আস্‌ছি।" আর একবার আমড়িয়া হইতে আসিতে পথে শ্রীকৈলাস স্বামীর সঙ্গে আলোচনা হইতেছিল "তাঁর উপর বিশ্বাস কর, নির্ভর কর, তিনি সব করে নেবেন। তিনি সব কর্ত্তে পারেন। তিনি দয়াময়, না চাহিতেই যার যা দরকার দিয়ে থাকেন। কিছু কত্তেও হয় না। শুধু নির্ভর, নির্ভর কত্তে পাল্লেই সব অভাব চ'লে যাবে।" শ্রীকৈলাস স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের একথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিলেন-- আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে ঐ মাঠের মধ্যের শূন্য আমভিটায় বসে আমরা তাঁর নাম করি, তাঁকে সব সঁপে দিয়ে বসে থাকি, দেখি তিনি আমাদের পানাহার করান কেমন ক'রে?" শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবের উপরে চলিতেন,—চলিতেছেন—যেই ঐ কথা অমনি সভক্তে উঠিলেন সেই আম ভিটায়, পাগলের পাগ্‌লামী আরম্ভ হইয়া গেল। পাগলচাঁদ এক আম্রবৃক্ষে উঠিয়া ডালে বসিয়া গান ধরিলেন। ৬০।৭০ জন সঙ্গী এক একজন এক এক ডালে, কেউ দাঁড়াইয়া কেউ বসিয়া, কেউ গাইতে লাগিলেন

কেউ নাচিতে লাগিলেন, কেউ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কেউ লম্ফঝম্প দিতেছেন. কেউ আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভাবোন্মত্ত ভক্তগণকে বাতাস করিতেছেন, ছায়া দিতেছেন। চৈত্র মাসের দ্বিপ্রহর। রৌদ্র ঝিম্ ধরিয়াছে। সেই ভিটা হইতে গ্রাম এক মাইল দেড় মাইল দূরে। জনমানব নিকটে নাই, জল ও নাই। কাহারও ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই। বাহ্যিক জ্ঞান ও নাই। তাহারা যেন এজগতের নয়, কোন এক জগতের। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের গানে ও ভক্তগণের ভাবে আকুল হইয়া গ্রাম হইতে দলে দলে মেয়ে পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সব খাবার লইয়া আসিতেছেন। তাহাদের আগমনে আনন্দ আরোও বাড়িয়া গেল। অবশেষে বেলা ৩টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাব সাম্‌লিয়া বাহ্যজগতে দৃষ্টি করিলেন এবং ভক্তগণের অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইয়া সকলকে শান্ত করিলেন। অতঃপর গ্রামবাসীগণের কাতর অনুরোধে তাহাদের আনীত খাদ্যবস্তু দ্বারা মহাপ্রসাদ তৈয়ারী করিয়া সকলে মিলিয়া গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। সেইদিন হইতে সকলে বুঝিল—শিশু জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার খাদ্য মাতৃস্তন্য স্বাভাবিক নয়, উহা তাঁহারই অহৈতুকী দয়ার দান।

আর একদিন, ১৩২৫ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত গনেশচন্দ্র হীরার বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মাষ্টমী মহোৎসব হয়। রাত্রিতে কীর্ত্তন হইতেছে। স্বামীজি দক্ষিণে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর বামে বসিয়া নিতাই গৌরের ভাবে বিভোর হইয়া বসা অবস্থায়ই বাহু তুলিয়া

দুলিতেছেন। ভক্তগণ ভক্ত বিপিনের রচিত গানের "মালা দুলছে প্রেমের হাওয়ায়, পাগল চাঁদের গলায় চাঁদের মালা দুলছে প্রেমের হাওয়ায়" এই অংশ গাহিয়াই ঝুমুর দিয়াছেন। সকলে ভাবে বিভোর। সকলেরই ঠাকুর স্বামীজির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ। ইহার মধ্যে হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় দুলিত বকুল ফুলের মালাটি আপনা আপনি উঠিয়া গিয়া গনেশচন্দ্রের গলায় গিয়া লাগিল! গনেশচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্শ্বদেশে ১০।১৫ জন ভক্তের পিছনে বাতাসের বিপরীত দিকে বসিয়া ছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত—বিস্মিত ও ভাবিত হইয়া গেলেন। এখনো ঐ অঞ্চলের লোকেরা ঐ মালার কথা আলোচনা করিয়া থাকে। এরূপে যে নিত্যই কত কত নূতন নূতন আলৌকিক অদ্ভুত অপূর্ব্ব ঘটনা সকল হাঁটিতে বসিতে খাইতে শুইতে, এমন কি শৌচে যেতেও হইত তা কে বলিয়া শেষ করিবে? কত মুমুর্ষুকে বাঁচাইলেন, কত অচেতনকে চেতন করিলেন। এ সহজ ভাবের পাগল মানুষের জলে-স্থলে-নভে, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র অবাধ গতিতে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভাবের কত খেলাই দেখিয়াছি। একেই বলে মানুষরূপে ভগবান্! একেই বলে অবতার শক্তি। একেই বলে জড়শ্চেতন শক্তির মধ্যে পূর্ণ চৈতন্য শক্তির বিকাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর মদ্ গাঁজা ভাং প্রভৃতি নেশাকর বস্তুর বড়ই বিরোধী ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কেহ, কি তাঁহার ভক্তের মধ্যে কেহ কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি বলিতেন, নেশা একমাত্র তাঁহাতেই করবে। ভগবানেই করবে। সেইই সর্ব

নেশার আকর। তাঁতে নেশা করলে আর ছুটবে না। অন্য নেশা সব তুচ্ছ হ'য়ে যাবে।" আর বিশ্রাম বার রবিবারে ভক্ত দিগকে বিশেষতঃ যে সকল ভক্ত গৃহী, সকামী তাঁহাদিগকে মাছ মাংস খাইতে নিষেধ করিতেন। এবং সংযমী হইয়া পবিত্রভাবে তাঁহার চিন্তা, তাঁহার নাম করিতে বলিতেন। ইহাতে সর্পভয়, অকালমৃত্যুর ভয়, অগ্নি জলভয়, পৈশাচিক ব্যাধি প্রভৃতির ভয় থাকিবে না। তাই দেখা গিয়াছে—১৩২৬ সালের প্রবল ঝটিকায় তাঁহার ভক্তঘরের একটি বিড়াল কুকুর এমন কি একটি পক্ষী পর্য্যন্তও মরে নাই। ইহা আমি বহু অনুসন্ধান—অন্বেষণ করিয়া বাহির করিয়াছি। মনে করিবেন না যে, আমরা সহজে বিশ্বাসী হইয়াছি, পুনঃপুনঃ যাচাই করিয়া করিয়া তবে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ঊনবিংশতি শতাব্দীতে যে মানুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে আসিয়া রাজধানী কলিকাতা নগরীতে বহির্মুখী গতিকে সজোরে টানিয়া অন্তর্মুখী করিয়া দিয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে বাঁচিবার পথে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যে মানুষ কৃষ্ণ বুদ্ধ খ্রীষ্টরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে আসিয়া এক একবার যুগ চক্রের গতি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, সেই চক্রধারীই এবার বাংলার মধ্যে আসিয়া সমগ্র পতিত জাতির যুগ যুগান্তরের নিম্নগতিকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া গেলেন। মানুষে মিশিয়া মানুষ হইয়া এমন সহজভাবের মানুষের লীলা যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই ধন্য হইয়াছেন, জীবন জনম সার্থক করিয়াছেন।

তাঁহার অহৈতুকী করুণার কথা মনে পড়িলে এখনও আনন্দে ভাবে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে। যে যখনি যে দায়, যে অভাব আসিয়া জানাইয়াছে, ঝড়বৃষ্টি, শীতাতপ, রাত্রিদিন সময় অসময় তুচ্ছ করিয়া, এমন কি নিজের অসুস্থ শরীর লইয়াও তখনি ছুটিয়াছেন—তাহাদের সুস্থের জন্য। শত শত রোগী শোকী, দীন দুঃখী প্রত্যহ বিদায় হইত। নিজে ঋণী হইয়াও দীনদরিদ্রের সেবা করিয়া কি আনন্দই পাইতেন। যেন সমস্ত জগতের জন্য, সমস্ত দেওয়ার জন্যই প্রভু এবার পাগল হইয়া আসিয়াছিলেন। দেখিলে মনে হইত সেই অদ্ভুত শরীরের মধ্যস্থিত অদ্ভুত সত্ত্বাটী যেন সমস্ত জগত ব্রহ্মাণ্ডেরই কেন্দ্র স্বরূপ। দীনদরিদ্র, মূর্খ আর্ত্ত, নিরাশ্রয় নির্য্যাতীত ও বদ্ধ-ভীতেরই মুক্তির জন্য —উদ্ধারের জন্য, ভ্রাতারূপে পিতৃমাতৃরূপে বন্ধুরূপে সহজ ভাবের আবরণ পরিয়া আসিয়াছিলেন। দীন-দরিদ্রের জন্য জগতে এমন ভাবে কেউ আর কাঁদে নাই। এমন খোলা প্রাণ দেওয়া ভাবে কেউ আর তাদের মধ্যে মিশে নাই। এক মাত্র প্রভু যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—"দীন যাহারা তাহারাই ধন্য। কেন না, স্বর্গ রাজ্য তাহাদেরই"। কিন্তু এ সহজভাবের পাগল মানুষ তাহাদের বন্ধু হইয়া কোল দিলেন, প্রেম বিলাইলেন, আপনার করিয়া সঙ্গে মিশাইয়া লইলেন। প্রভু যীশুর প্রধান ভক্তগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নিম্নশ্রেণী জালিক সম্প্রদায়ের, আর ইহারও প্রভু শ্রীচরণ প্রান্তে হাড়ি মুচি ডোম আসিল আশ্রয়

পাইল, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য আসিল, আশ্রয় পাইল, ধোপা নাপিত প্রভৃতির বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু আসিল আশ্রয় পাইল, মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান আসিল আশ্রয় পাইল। ধনীদরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ নরনারী যেই আসিল সেই আশ্রয় পাইল। যে ধনের আশায় আসিল সে ধন পাইল, যে জনের আশায় আসিল সে জন পাইল, যে জ্ঞানভক্তি, কর্ম্ম-মুক্তি যে যে প্রকারের আশা লইয়াই আসিল সকলে তত্তৎ ভাব পাইয়া সমস্ত অভাব দৈন্য ভুলিয়া গেল, ধন্য হইয়া গেল এবার সকলকে পূর্ণ করিতেই প্রভু পূর্ণ রূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণ-বুদ্ধ খ্রীস্ট, আল্লা-ব্রহ্মা কালী, দুর্গা-মনসা চণ্ডী হরি সকল দেব দেবীই মানিতেন। এক এক সময় তাঁহাদের এক এক ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। আবার কাহাকেও মানিতেন না, একথা বলিলেও মিথ্যা হয় না। কারণ তিনি সর্ব্বক্ষণই আপনাতে আপনি মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। সর্ব্বময় হইয়া থাকিতেন; যখন যে ভক্ত যে ভাব লইয়া নিকটে আসিতেন, সে ভক্তে তাঁহার সেই ভাবেই দর্শন পাইয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাইত এমানুষে "খৃষ্টিয়ানে ভাবে খৃষ্ট, বৌদ্ধে ভাবে বুদ্ধ, মোসলেমে কহে আল্লা তুমি নিত্যশুদ্ধ।" বলিয়া নিত্য স্তব স্তুতি করিতেছেন। এ নিত্য-শুদ্ধ ঠাকুর সর্ব্বরূপই ধ্যান করিতেন, জগতের সর্ব্বনাম শ্রবণেই ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন। তিনি শিশুর নিকট শিশু, বৃদ্ধের নিকট বৃদ্ধ, যুবার নিকট যুবা, পুরুষের নিকট পুরুষ, আবার

নারীদের নিকট নারীরূপে প্রকাশ পাইতেন। বস্তুতঃ এ সর্ব্বরূপী মানুষ "কি যেন কি"ই ছিলেন। যে যেমন তাহার কাছে তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতেন। এমন বাল-গাম্ভীর্য্য ভাবের সমাবেশ আর দেখা যায় নাই। সকলে যেমন তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত তেমন আবার স্নেহ ভালবাসায় পুত্রকন্যাবৎ ভাবিয়া মধুর বাৎসল্য স্নেহ রসে পরিপ্লুত হইয়া যাইত। একাধারে শ্রীশ্রীঠাকুরে গৃহী, ত্যাগী, সন্ন্যাসীর ভাব, রাজসিক সামাজিক ধার্ম্মিকের ভাব, আবার উহাতে সর্ব্ব প্রকারের সংস্কারের ভাবও সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত। কর্ম্মে এমন ব্যাপৃত থাকিতেন যে, দিবারাত্র মাত্র ৩।৪ ঘণ্টার বেশী বিশ্রাম কি নিদ্রায় থাকিতেন না। অধিকাংশ রাত্রিই কীর্ত্তনে কথনে আনন্দে কাটাইয়া দিতেন। জগতে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অকামনা প্রেমভক্তি এবং সত্য চৈতন্যশক্তি প্রদান করিতেই এবার এ অপূর্ব্বভাবের লীলা। লীলাশেষে ভাবের মানুষ তাঁহার স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য ভাব গ্রহণ করিলেন। জগতের স্থূলাবলম্বী জীবের সেই দুঃখের দুর্দ্দিন বাংলা ১৩৩১ সালের ১০ই আষাঢ় সোমবার।

বহু যুগযুগান্তরের অবজ্ঞাত উপদ্রুত শিক্ষালোক বর্জ্জিত অনুন্নত সমাজের মধ্যে শিক্ষালোক প্রবেশ না করাতে হিন্দু সমাজের প্রধান অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। এ অনুন্নত সমাজের মধ্যে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে সমাজ অঙ্গ যে পরিপুষ্ট হইবে না। তাই এতদ্দেশের অনুন্নত

সমাজের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধান ও সেবাধর্ম্ম জাগরুক করিয়া দীনদরিদ্র ও আর্ত্তের সেবাদ্বারা সর্ব্ববিধ মুক্তির উপায় করিয়া দিবার জন্য এবং যাহাতে তাঁহার অনুগামী সেবকগণ ভোগ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া দেশ ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার সুযোগ পায় তদুদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর একটী কেন্দ্রীয় মঠ ও মিশনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া রাহুথড়ের সেই "আলোক ডাঙ্গা"য়ই এই মঠ ও মিশনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাই আজ আমি হৃদয়ের সহিত শ্রীশ্রীদীনবন্ধু মঠ ও মিশনের কর্ম্মীগণ, তাঁহার গৃহীভক্তগণ এবং অভ্যাগত সাধুসজ্জনগণকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়ই আহ্বান করিতেছি—ওগো, বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যা অতীত হয়ে গেছে তা গেছে, ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তা কে জানে? অতএব বর্ত্তমানের কার্য্য বর্ত্তমানে ক'রে যাও। বর্ত্তমানের ভাব বর্ত্তমানে গ্রহণ কর। বর্ত্তমানের হাওয়ায় জীবনতরীর পাল টেনে দাও। সহজভাবে জীবন সাফল্য কর। ইহাই বর্ত্তমানের ধর্ম্ম। ওম্।*

শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

---

* ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় ধীরেন্দ্রনগর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকাশ মহোৎসবে ভক্তসম্মেলনীতে দেশ সেবায় সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ ঠাকুর মহারাজ নগেন্দ্রনাথের শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

সম্পূর্ণ।